মাসিক

আলোকধারা

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং চ-২৭২
২৮তম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল ২০২২ ঈসায়ী

মহান ২২ চৈত্র
উর্‌স শরিফ সংখ্যা

একনজরে

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র
১১৬তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ ২০২২ উপলক্ষে
মাইজভাণ্ডার শরিফ দরবার-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মন্‌জিলের পক্ষে

সালাত আদায়

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রওজা গাহে প্রবেশ

পবিত্র রওজায় সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মোনাজাত

অসিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী'র রওজায় সম্মান প্রদর্শন

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী'র পবিত্র রওজায় সম্মান প্রদর্শন

আখেরী মোনাজাত

১১৬তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের সাথে গাউসিয়া হক মন্‌জিল কর্তৃপক্ষের সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মহিনুল হাসান

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত 'উম্মুল আশেক্বীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফযখানা'র নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন শেষে শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী

আলোকধারা

THE ALOKDHARA

A MONTHLY JOURNAL OF TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং চ ২৭২, ২৮তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

এপ্রিল ২০২২ ঈসায়ী

শাবান-রমযান ১৪৪৩ হিজরী

চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৮-২৯ বাংলা

প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রক্ত ও ত্বরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার- মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক

অধ্যাপক জহুর উল আলম

যোগাযোগ:

০১৭৫১ ৭৪০১০৬

০১৩১০ ৭৯৩৩৩২

মূল্য : ২০ টাকা $=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট

পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ০২৩৩৪৪৫৪৩২৬-৭

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা

www.sufimaizbhandari.org.bd

E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

- সম্পাদকীয় ---------- ২
- উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফ্‌যখানার নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাহ্‌বারে আলম শাহ্ সুফি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র বক্তব্য' ----------৩
- বেলায়তে মোত্‌লাকা (নবম পরিচ্ছেদ) খাদেমুল ফোক্বারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বেলায়ত রহস্য ফজিলত-ই-রব্বানি ----------৫
- উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) মোঃ গোলাম রসুল ---------- ৯
- আহলে বাইতের তাসাওউফ জগৎ অধ্যাপক জহুর উল আলম ---------- ১১
- গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র পদসোপান সম্পর্কে "বাহজাতুল আসরার" গ্রন্থে'র উদ্ধৃতি আলোকধারা প্রতিবেদন ---------- ২০
- প্রসঙ্গ : তাসাওউফের অলংকার নীরবতা এবং গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ---------- ২২
- সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজের বাণী ----- ২৩
- প্রসঙ্গ: মুসলিম উম্মাহ্‌র আদর্শিক উত্থানের স্বার্থে গবেষণা কর্মের অনিবার্যতা – আলোকধারা ডেস্ক ---------- ২৪
- মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যে রাসূল (দ.) প্রশস্তি – আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল ---------- ২৯
- একুশ শতকে মুসলিম উম্মাহ্‌র চ্যালেঞ্জঃ প্রেক্ষাপট, সমস্যা এবং সমাধান জাবেদ বিন আলম ---------- ৩৫
- ফতুহাতে মক্কিয়া অনুবাদ : আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী ----------৩৯
- 'আয়নায়ে বারী' কিতাবের ভাবার্থ এস এম এম সেলিম উল্লাহ্ ----------৪১
- ফকিহ্ : ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (রহ.) – সৈয়দ আবু আহমদ ---------- ৪৩
- হে অতীত কথা কও ---------- ৪৫
- আমি ইসলামের অনুরাগী অনুবাদ: মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ৫২
- শিশুতোষ – আবুল ওয়াসিফ ---------- ৫৬

সম্পাদকীয়

মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া। আলোকধারা এপ্রিল সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এ সংখ্যায় গাউসুল আযম বিল বিরাসাত হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র শানে রয়েছে মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম রচিত একটি নিবন্ধ এবং 'হে অতীত কথা কও' শিরোনামের আওতায় সৈয়দ আমিরুল ইসলাম নিবেদিত একটি কবিতা। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ত্বরিকত পথে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় বাবা ভাণ্ডারী হলেন এক অনন্য স্বতন্ত্র বিরল উপমা। সাধনাকালে তিনি ইশ্‌কের আগুনে দগ্ধ হয়ে হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত। ইশকের অনির্বান এই দাবানল অতঃপর মাশুকের পরম তৃপ্তিময় আলিঙ্গনে আগ্নেয়গিরির লাভা শীতল-প্রশান্ত হয়ে অবারিত জলধারার করুণাবারি হিসেবে নিঃসৃত হয়ে চলেছে সর্বত্র। বাবা ভাণ্ডারী ইসমে 'রহমান' সিফতে প্রবহমান করুণাধারা। "ইসমে রহমান" বালা-মুসিবত-আজাব-গজব থেকে পরিত্রানের প্রত্যাশায় বদলা গ্রহণকারী তথা খোদা তা'য়ালার নিকট সুপারিশকারী। কিন্তু চলমান বিশ্বব্যবস্থা অন্যায়, অবিচার এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জাহেলী কার্যাদির বিরুদ্ধে মজলুম, অত্যাচারিত, প্রতারিতদের করুণ ফরিয়াদ এবং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বিচারের সম্মুখীন। 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে ইসমে 'রহমান' প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- "চোরের ধর্ম চুরি করা। ইহার ফলস্বরূপ ধরা পড়িয়া বিচারের সম্মুখীন হইতে হয়। বিচারাদালত অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আইনের ধারামতে চোরের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। বিচারক নিজে কোনরূপ দয়া বা অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে পারেন না। যেহেতু চোর নিজ কৃত অপরাধের মাত্রা দ্বারা নিজেই তাহার শাস্তির মাত্রা নিরূপন করিতেছে। সুতরাং একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় এখানে চুরির কর্তা অর্থাৎ চোর বিচারাদালতে তাহার নিজ কর্মফলের নিয়ন্তা এবং বিচারাদালতের উপর প্রভাবশালী। বিচারক বিচারবেলায় তাহার দয়াগুণ কাজে লাগাইতে পারেন না। উপরন্তু বিচারপ্রার্থীর বিষয়ে সুপারিশও করিতে পারেন না।" এখানে 'ইসমে আল্লাহ্'র সর্বময় একক ইচ্ছাই কর্তৃত্বাধীন থাকে। বর্তমান বিশ্ব ২০১৯ থেকে কোভিড মহামারীর আঘাতে বিধ্বস্ত ও বেসামাল হয়ে পড়েছে। মানুষের দূর্গতির শেষ নেই। এর মধ্যে মানব বসতির সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং উপযোগী গ্রহ পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি ধ্বনিত হচ্ছে কোন এক প্রতাপশালী কথিত রাষ্ট্রনেতার কণ্ঠ থেকে। এধরনের অসহায় পরিস্থিতিতে 'আল্লাহ্‌র খলিফা' হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরিত মানব সন্তানের একমাত্র ভরসা হচ্ছে আল্লাহ্‌র রহমানিয়াতের দরজা উন্মুক্ত করার জন্যে ফরিয়াদ পেশ করা। মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ্‌র অসীমত্বের প্রশংসার একমাত্র যোগ্য মুখপাত্র মানুষ। আল্লাহ্‌র খিলাফতের জিম্মাদারিত্ব মানুষ সীমিত সময়ের জন্যে বজায় রাখতে সক্ষম হলেও অসংখ্য ভুল-বিচ্যুতি-দাম্ভিকতায় অপরাধের পাল্লা এতো ভারী হয়ে আছে যে, আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারে করুণা প্রার্থনা করার মতো হিম্মত মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। তবে আমাদের আবেদন অসুস্থ পাপ-পংকিলতা, দুরাচার, অপরাধ, অবাধ্যতা, অস্বীকারপ্রবণতা, ক্ষমতার দাম্ভিকতা, পারস্পরিক রক্তলোলুপতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করেও একথা অনস্বীকার্য যে মানুষের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। তিনি অসীম দয়াগুণে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি দয়া করে বাঁচালে আমরা বাঁচব এবং ক্ষমা পাব। আল্লাহ্ তাঁর অতুলনীয় দয়াগুণে পরম দয়ার্দ্র হয়ে মার্জনার দুয়ার উন্মুক্ত করে মানুষের অপরাধকে ক্ষমা করে পৃথিবী নামের গ্রহকে সজীব-সতেজভাবে মানবিক চেতনা বিকাশের ধারায় রক্ষা করুন। ২২শে চৈত্র বাবা ভাণ্ডারী কেবলার পবিত্র উরস উপলক্ষে আর্ত-মানবতার করুণ কান্না এবং আকুল ফরিয়াদ মঞ্জুর করুন।

এপ্রিল ২০২২ সংখ্যা আলোকধারায় আল্লাহ্‌র অপার ইচ্ছায়, রাসুলে কারীম (দ.)'র অশেষ দয়ায়, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র মেহেরবানিতে সমৃদ্ধ তথ্যবহুল প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এবারও উম্মুল আশেকিন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) সম্পর্কিত স্মৃতিকথা প্রকাশের লক্ষ্যে ইচ্ছুক লেখকদের লিখা পাঠানোর জন্যে তাগাদা হিসেবে "উম্মুল আশেকিন স্মরণে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি" ছাপানো হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু লিখা আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমরা আশা করছি দ্রুত আরও লিখা আমাদের সমীপে জমা পড়বে। এবার ছাপানো হয়েছে, এতিমখানায় রাহবারে আলম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) প্রদত্ত ভাষণ, ত্বরিকত সম্পর্কে সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (ক.)'র বাণী, বেলায়তে মোত্‌লাকার সারানুবাদ নবম পরিচ্ছেদ, উম্মুল মু'মিনিন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.), আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ : মাওলা আলী মুশকিল কোশা, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পদমর্যাদা সম্পর্কে 'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থে লিখিত বড়পীর গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র অভিমত সম্পর্কিত দলিল, বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম স্মরণে নিবেদনমূলক নিবন্ধ, গবেষণার অনিবার্যতা প্রসঙ্গে আলোকধারা ডেস্ক প্রতিবেদন, মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যে রাসুল (দ.) প্রশস্তি, একুশ শতকে মুসলিম উম্মাহর চ্যালেঞ্জ, ফতুহাতে মক্কিয়া ও আয়নায়ে বারী'র নিয়মিত অনুবাদাংশ, হে অতীত কথা কও শিরোনামে মরহুম জামাল আহমদ সিকদার, শওকত হাফিজ খান রুশ্নি, সৈয়দ আমিরুল ইসলামের লিখা প্রবন্ধ-কবিতা ছাপানো হয়েছে। রয়েছে শিশুতোষ সম্পর্কিত মুহাম্মদ ওহীদুল আলমের অনুবাদ এবং শিশুতোষ বই পড়ার নেশা। সবকিছু মিলে আমরা আলোকধারায় বিচিত্র ধারণা সংযোজনে সচেষ্ট আছি। আলোকধারাকে সমৃদ্ধ করার মানসে আমরা পাঠকদের সহযোগিতা এবং মতামত প্রত্যাশা করি। মহান আল্লাহ্ সকলের কল্যাণ করুন।

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফ্‌যখানার নব নির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাহ্‌বারে আলম শাহ্‌ সুফি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র বক্তব্য

যারা এই সুন্দর একটি ভবন নির্মাণের উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন, সুচারুরূপে এই নির্মাণ কাজ পরিচালনা করেছেন তাদেরকে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং ভবিষ্যতমুখী চিন্তা নিয়ে এই আধুনিক একটি ভবন করেছেন। আমি মনে করি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কেননা ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের এই দেশ অত সম্পদশালী নয়। সেজন্য এই প্রতিষ্ঠানে যাদেরকে নিবাসী হিসেবে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হয় তারা মূলত বঞ্চিত। তারা একটি লুকানো সম্পদ হিসেবে হয়তো হারিয়ে যেতে পরতো, ভবিষ্যতটি হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারতো, সে জায়গায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেই মানব সন্তানগুলোকে এনে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার যে কাজ আপনারা করে চলেছেন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্যগতভাবে এই কাজটি, যেটি আসলে আমাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক একটি দায়িত্বের অংশ। এটি কোন করুণার বিষয় নয়। এই কাজটি অনেক সময় করা হয় খুব অবহেলার সাথে। হয়তো আপনারা সেই ধারা থেকে বের হয়ে যে শিশুরা অবহেলিত, বঞ্চিত, তারা হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত একটি জীবনের মুখোমুখি হতে পারত – সে জায়গায় আপনারা তাদেরকে যেনতেনভাবে নয়, সম্মানের সাথে, যাতে তারা আত্মমর্যাদা নিয়ে বড় হতে পারে সে রকম একটি পরিবেশ দিয়ে তাদেরকে বড় করার, তাদের সেবা করা, তাদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন – আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন আপনাদের সে চেষ্টাকে কবুল করুন।

প্রচলিত ধারা থেকে বের হয়ে ট্রেন্ডের পাঞ্জাবি পড়ে এলাকায় এলাকায় মেজবানে শরীক হয়ে কিংবা খতম পড়ে এক ধরনের নির্ভরশীলতার এবং অসহায় একটি জীবন যাপন থেকে আপনারা যে তাদেরকে নিজের সন্তানকে যেভাবে আমরা বড় করি ঠিক সেভাবে না পারলেও কাছাকাছি একটি মর্যাদা দিয়ে তাদের আত্ম সম্মান বোধকে অটুট রেখে যাতে তারা ভবিষ্যতের জন্য তারা তৈরি হতে পারে তার জন্য আপনারা চেষ্টা করছেন। যে বিশাল আয়োজন করেছেন, এই আয়োজনগুলো আরও অনেক স্বল্প পরিসরে করা যেত। অনেক আয়োজন না করলেও হয়তো হতো, কিন্তু একে তো ভবিষ্যতমুখী চিন্তা করেছেন, দ্বিতীয়ত তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুর কোমল মন-মানসিকতা যাতে মন বড় করে করে জীবন-যাপন করতে পারে, সেজন্যে আপনারা অনেক প্রচেষ্টা নিয়েছেন। **এই এতিমখানা শব্দটা, আমি আমার জায়গা থেকে আগেও বলেছি কিনা জানিনা "এতিমখানা" শব্দটাও আমি মনে করি আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। এটি তাদেরকে বারে বারে মনে করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই যে, "তুমি এতিমখানায় বড় হচ্ছ, তুমি এতিমখানায় বড় হচ্ছ।" এটি তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোন গৌরব আছে বলে আমি মনে করিনা।** এটি হয়তো ঐতিহ্যগত হয়ে এসেছে বলেই হয়ে এসেছে। অনেক সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে আজকাল এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে। উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম নামটি রেখে সাথে হয়তো সুন্দর একটি নাম যোগ করা যেতে পারে। আমি জানিনা সেটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা আইনগতভাবে কতটা সম্ভব। কিন্তু এটিকে আমি মনে করি সুন্দর একটি নাম দিয়ে– সরকার যেমনটি করে, এ ধরনের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার সম্ভবত "শিশু সদন" বা এ ধরনের কিছু নাম দিয়ে থাকেন। আমি আরও অনেক দেখেছি এই ধরনের সুন্দর একটি নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠান করতে, আমি মনে করি এ ধরনের সুন্দর একটি নাম দিয়ে তাদেরকে আরও উজ্জীবিত করা উচিত। তাদের অন্তরকে সর্বদিক থেকে আরও যাতে প্রসারিত করা যায় সেই ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত। আবাসিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়টি আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগেও দেখেছি। কোরআন শরীফ এবং হাদিস শরিফে এতিমদের খেদমত করাকে, তাদের সেবা করাকে বিপুলভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমরা দেখেছি যে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান করে সেটি করা হতোনা। সেটি দায়িত্বটি পরিবারই নিত। অর্থাৎ পরিবারের সদস্য হিসেবে তাদেরকে লালন-পালন করা হতো। যেহেতু আমাদের অবস্থার পরির্বতন ঘটেছে, বাস্তবতার পরির্বতন ঘটেছে এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে হয়তো একটি নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান করে সেখানে শিশুদেরকে লালন-পালন করার। কিন্তু আমি মনে করি সেখানে মা বাবা থেকে দূরে অবস্থান করার ফলে তাদের ভিতরে লুকিয়ে রাখা মানসিক কষ্টটি লাঘব করার একটি বড় দায়িত্ব আপনাদের রয়ে গেছে। যাতে তারা কোন অবস্থাতেই মনে করতে না পারে যে, তারা তাদের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তাদের মা-বাবার মায়া থেকে, আদর থেকে অনেক দূরে থাকতে হচ্ছে। সেই মা-বাবার আদরটি দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের এবং সেটি আপনারা করে যাচ্ছেন– আলহামদুলিল্লাহ্‌। আমরা আশা করি যে, দরবারে পাকের পক্ষ থেকে উম্মুল আশেকীনের পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান আরও বড় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং আরও অনেক

বঞ্চিত, অসহায় মানব সন্তানের খেদমতে খেদমতে অবদান রাখতে পারবে। আমি বিশেষ করে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সব সময়ের জন্য, শিক্ষকবৃন্দ, পরিচালনা পর্ষদ এবং আশেকানে মাইজভাণ্ডারী, আশেকানে হক ভাণ্ডারী যারা নিজেদের শ্রম-সময়-সম্পদকে কোরবানী করেছেন এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, অসহায় বঞ্চিত আমাদের নব প্রজন্মকে একটি মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়ার জন্য যারা খেদমত করেছেন সকলের খেদমত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কবুল করুন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যেই অবকাঠামো এখানে আছে, আরও অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আপনাদের সকলকে এর আরও বৃহত্তর খেদমত করার জন্য জানে-মালে তাওফিক আত্বা করুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

রাহবারে আলম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম. জি. আ.) 'এতিম' শব্দ সম্পর্কে শ্রোতা ও উম্মাহ্‌র সম্মুখে এক ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের আবেদন পেশ করেছেন। 'এতিম' শব্দটি পবিত্র কোরআনে পিতৃ-মাতৃহীন শিশু-কিশোরদের জন্য ব্যবহৃত ভাষা। এদিক থেকে শব্দটি গভীর তাৎপর্যবহ। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে 'এতিম'দের সঙ্গে আচার-আচরণ, তাদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে বার বার উম্মাহ্‌কে সতর্ক করে দিয়েছেন। কোরানিক সতকর্তা এবং নির্দেশনা সত্বেও 'এতিম' বিষয়ে আমাদের জন্য সমাজে এক ধরনের হীনমন্যতা বিদ্যমান আছে।

এতিম শব্দটি আমরা প্রায়শঃ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। মাতা-পিতা পৃথিবীতে নেই বলে আমরা এতিমকে করুণা নির্ভর এক ধরনের 'ভাড়' হিসেবে মনে করে থাকি। এতিমখানা, এতিম– যেন আদর-সোহাগ বঞ্চিত এক ধরনের অভাগা প্রাণি। আমাদের সামাজিক আচার-অভ্যাসে 'এতিম' প্রায়শঃ অবহেলায় উচ্চারিত খোঁটাযুক্ত শব্দ। কোন এতিমের মানসিক বিকাশ পথে তা অত্যন্ত মনোপীড়ন ও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দেয়। আমরা যখন 'এতিমখানা' শব্দ ব্যবহার করি তখন তা অশ্রুহীন, ছায়াহীন অর্থেই ব্যবহার করে থাকি। মানুষের স্বভাবজাত মোড়লী আদলে বিষয়টি অনেকাংশে কদর্যতায় ভরপুর হয়ে উচ্চারিত হয়। যদিও পবিত্র কোরআনের ভাবাদর্শানুযায়ী 'এতিমের' উপর রয়েছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র অভিভাবকত্ব এবং ছায়া। পিতা-মাতার উপস্থিতির অভাবে আদর-স্নেহ-মায়া-মমতা বঞ্চিত এ সকল শিশু-কিশোর-কিশোরী যেন আমাদের স্বভাবজাত উপেক্ষাধর্মী আচরণ-উচ্চারণের কারণে 'এতিম' হবার গঞ্জনায় মানসিক হীনতায় নিমজ্জিত না হয় সে জন্যে পৃথিবীর সভ্যদেশগুলোতে পিতৃ-মাতৃহীনদের আশ্রয় স্থল এবং শিক্ষাগারকে 'শিশু সনদ', 'শিশু বাগ' প্রভৃতি সুন্দর শব্দে সম্ভাষিত করে থাকে। এর ফলে কোরানিক শব্দ 'এতিম'র মাহাত্ম্য এবং সম্মান যেমন সুরক্ষিত হয়, তেমনি শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশও সরল-সহজ হয়ে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

রাহবারে আলম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম. জি. আ.) আমাদের চলমান সমাজে প্রচলিত, নির্মম শব্দচিত্রের বিষয়টি কোনরূপ রাখ ঢাক না রেখে রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে 'এতিমখানা'র পরিবর্তে 'শিশু সদন' বা এ ধরনের অন্য কোন সুন্দর নামকরণের প্রস্তাব করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সচেতন সমাজকর্মী, ধর্মীয় পণ্ডিত এবং সুধীনজনরা ভেবে দেখলে সামাজিক রূপান্তরে কল্যাণ বয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে।

উম্মুল আশেকীন স্মরণে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর কর্মময় জীবন, আশেকীনদের সঙ্গে পরিচয়, যোগাযোগ এবং মতবিনিময় সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত একটি স্মারক সংকলন প্রকাশের বিষয়ে আলোকধারা কর্তৃপক্ষ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উম্মুল আশেকীনের সঙ্গে জড়িত ঘটনা প্রবাহ এবং স্মৃতিকথা নিয়ে তথ্য দিয়ে ইচ্ছুক লেখক-লেখিকাদেরকে সহযোগিতার জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে মহিলা ভক্তদের স্মৃতিচারণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করায় এ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট কার্যালয় / মাসিক আলোকধারা সম্পাদক সমীপে অথবা ই-মেইল: sufialokdhara@gmail.com প্রেরণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেলায়তে মোত্‌লাকা (নবম পরিচ্ছেদ)

খাদেমুল ফোক্বারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

বেলায়ত রহস্য

ফজিলত-ই-রব্বানি

হযরত আদমকে (আ.) যেভাবে বলা হয় ***"আল্লামা আদামাল আসমা'য়া কুল্লাহা"*** অর্থাৎ আল্লাহ্ আদম (আ.) কে তাঁর সমস্ত নামাবলির জ্ঞান দান করেছেন এবং আল্লাহ্‌র খলিফা নিযুক্ত করেছেন। ঠিক তেমনি যুগে যুগে সমস্ত গুপ্ত, ব্যক্ত খোদায়ী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও খোদার খলিফা এবং পবিত্র রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি। আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (র.) মসনবি শরিফে বলেন:***"প্রত্যেক দাওরা বা বৃত্তে (সময় বা কালবৃত্তে) জগতের আবর্তনের বিবর্তনের যুগে একজন অলিয়ে কামেল বিদ্যমান থাকবেন; যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে"***। (১) ***"প্রকৃত অর্থে সেই ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ্‌র নায়েব বা প্রতিনিধি, যে ব্যক্তির দিলের (মনের বা অন্তরের) মধ্যে খোদার হুকুম নাজেল বা অবতীর্ণ হয়"***। (২)

এই ফজিলতে রব্বানির বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (র.) মসনবি শরিফে বলেন :***"মানব যখন খোদায়ী জ্যোতিঃ (আল্লাহ্‌র পবিত্র নূর বা আলো) আহরণকারী হয়, তখন সেই ব্যক্তি ফেরেশতাদের সেজদা গ্রহণকারী সাব্যস্ত হয় (নির্ধারিত হয়)। ঐ সব ব্যক্তিরাও তাঁকে সেজদা করে, যারা ফেরেশতার মতো হয়েছে। অর্থাৎ যারা হেকারত হিংসা, অবাধ্য প্রকৃতি ও সন্দেহ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত"***। (৩)

সেজদা এবং এর আভিধানিক অর্থ:

সেজদা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কপাল মাটিতে রাখা, মাথা নত করা, হুকুম মান্য করা, আজিজি করা (বিনয়ভাব প্রকাশ করা), বা নম্রতা প্রকাশ করা ও ভয় করা ইত্যাদি।

শরিয়া অনুসারে সেজদার অর্থ:

শরিয়া অনুসারে সেজদার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করার সময় তাঁর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং বন্দেগী সমাপনার্থে সকাতরে নিজ কপালকে মাটিতে রাখা, এসময় ইবাদত বা নামাজের নিয়মাবলী- আরকান, আহকাম মান্য করা একান্তই কর্তব্য। এর মধ্যে আরো যা কিছু রয়েছে যেমন, পবিত্রতা, পশ্চিমমুখী হওয়া, ইবাদতের নিয়ত করা, রুকু করা, তসবিহ পড়া, সেজদা করা ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা:

রাত-দিন ও চন্দ্রসূর্য খোদার নিদর্শন; তাদেরকে সেজদা করবে না। তোমরা তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে এরকম অবস্থায় সেজদা করো, যেমন তা যেন হয় তোমরা বিশেষ করে (সত্যিকার অর্থে) মহান আল্লাহ্‌তায়ালারই ইবাদত করছো। (৪) পবিত্র কোরআনের ইস্তিলাহ মতে বা পরিভাষা অনুসারে সেজদা শব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এজন্য এটাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: ***১) সেজদা-ই-তা'য়াব্বুদি*** এবং ***২) সেজদা-ই-তায়াজিমি।***

১) সেজদা-ই-তা'য়াব্বুদি: আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদতে আল্লাহ্‌তায়ালাকে যে সেজদা করা হয়, তাকেই বলে সেজদা-ই-তা'য়াব্বুদি; যা কোরআন শরিফ দ্বারা প্রমাণিত।

২) সেজদা-ই-তায়াজিমি: হযরত আদম (আ.)-কে ফেরেশতাগণ এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর পিতামাতা এবং ভাইগণ (ভ্রাতৃবৃন্দ) যে সেজদা করেছিলেন, সেটাকে সেজদা-ই-তায়াজিমি বলা হয়। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন: ***"যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম আদমকে সেজদা কর"***। (৫)

কোরআন পাকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বাণী: ***"আমি তাদেরকে আমাকে সেজদা করতে দেখেছি।" (৬)*** এই আয়াত অনুসারে দেখা যায় সেজদা শুধুমাত্র বন্দেগি বা ইবাদতেই ব্যবহৃত হয় না; এটি তায়াজিম বা সম্মান প্রদর্শনার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত আদম (আ.) এর সম্মানার্থে তাঁকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর নবুয়ত ও সুলতানাতের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁর পিতা ও ভাইদেরকে সেজদা করতে দেখা গেছে। এরকমভাবে ইবাদতের নিয়ত ও নিয়ম-কানুন ছাড়া যে সেজদা সম্মানার্থে করা হয়, তাকে ***সেজদা-ই-তায়াজিমি*** বলে। এটা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নয়, বরং এই সেজদাকে বলা যায় উচ্চস্তরের সালাম বা তায়াজিম।

সেজদা-ই-তেলাওয়াত:

এই সেজদা পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা ও শোনার সময় করা হয়। এটাকেও বলা হয় মহান আল্লাহ্ সমীপে ***সেজদা-ই-তা'য়াব্বুদি***।

অলি-আল্লাহ্‌গণ, যাঁরা ফজিলত-ই-রব্বানি বা মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কল্যাণ বা সৌভাগ্যপ্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতা ও জ্যোতিঃ আহরণকারী তাঁদেরকে দেখা (তাঁদের কথা

শ্রবণ করা) এবং তাঁদের কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা) দর্শন, আল্লাহ্‌তায়ালার আয়াতের (আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণীর) ও বুজর্গির (অসীম মাহাত্ম্যের) প্রত্যক্ষ দর্শন বটে। যেহেতু ***"ফানা-ই-তাকাজাত-ই-নফসানির"*** (পাপ এবং কামস্পৃহা ধ্বংসের কারণে) ফলে তাঁরা আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তর ***ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ'***র দরজায় উপনীত হতে পেরেছেন। (৭) ***(আয়না-ই-বারি, পৃ. ৪০৭-৪০৯ দ্রষ্টব্য)***

সেজদা যে শুধু মাটিতে কপাল রাখলেই হয় তা নয় বরং স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও আন্তরিক বিনয় প্রকাশ করাকেও সেজদা বলে। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কোরআন শরিফে উল্লেখ আছে: ***"তোমরা কী দেখছো না আসমানবাসী ও জমিনবাসী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগত বিরাট সংখ্যক মানবগণ আল্লাহ্‌তায়ালাকে সেজদা করে।" (কোরআন, সূরা হজ্ব: আয়াত ১৮) (৮)*** অথচ এদের প্রত্যেকের (মানবগণ ছাড়া) কপাল নেই। কপাল রেখে সেজদা করতে সবাইকে দেখাও যায় না। কাজেই বুঝা যায় যে, বিনয় ও আজিজীই সেজদার প্রধান বস্তু।

এই ফজিলত-ই-রব্বানির তায়াজিমের স্বীকৃতি দিতে গিয়ে হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণসহ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সেজদা করেছিলেন। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ.)-কে বলেছিলেন, ***"এটা আমার ইতোপূর্বে দেখা স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা"***। (*আল কোরআন*, সূরা ইউসুফ : আয়াত ১০০) আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আ.)-কে সেজদা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবলিস বা শয়তান ছাড়া সবাই আদম (আ.)-কে সেজদা করেছিলেন।

মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী (মন্দাকিনী নিবাসি) সেজদা সম্পর্কে লিখেছেন:

"ছজিদা সহজ কথা নয় ছজিদা সহজ কথা নয়
করিলে মোশরেক না করিলে কাফের হয়।
ওয়াছ্‌জুদ বলিল যবে ফছজুদু তারা সবে
ইনকার করিল যেবা মরদুদ নিশ্চয় ॥
ছজিদা ডরের কথা না করিও যথাতথা।
আদমজাদা আদম হইলে ছজিদা টানি লয় ॥"

হযরত মুসা (আ.) অহঙ্কারি লোকদেরকে বলেছিলেন: ***"তোমরা বায়তুল মোকাদ্দাসের ছোট নিচু দরজা দিয়ে সেজদা করতে করতে প্রবেশ করো এবং বল 'হিত্তাতুন' অর্থাৎ 'অবনত' (হে প্রভু আমরা অবনত)।"*** এতে বুঝা যায়, হযরত মুসা (আ.) সবাইকে অবনত হওয়ার জন্য আদেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌পাক হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনায় শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, :***"আদমের কাছে অবনত হলে না কেন? যাকে আমি আমার নিজ দুই হাতে তৈয়ার করেছি। তুমি কী অহঙ্কার করলে? অথবা নিজেকে 'আলী' বা বড় মনে করলে?"*** (৯) (*আল কোরআন*, সূরা সোয়াদ: আয়াত ৭৫) ***"যাকে আমি আমার নিজ দুই হাতে তৈয়ার করেছি"*** কোরআন পাকের এই বাণীর প্রতি নজর দিলে এর ব্যাখ্যা বুঝা যায়; ব্যাখ্যা হলো "হাকায়েক-ই-রবুবিয়ত" যার অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা রহস্য এবং "উলুহিয়ত-ই-সমদিয়ত" যার অর্থ হচ্ছে উপাস্য রহস্য। আল্লাহ্‌তায়ালার নিজ মগ্নচিত্ত প্রকৃতি হযরত আদম (আ.)-এর অস্তিত্বে উদ্ভাসিত ও সমাবেশিত, যাকে বলা চলে "জামালি" বা সুরম্য এবং "জালালি" বা প্রভাবশালী প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ, এটাই এর ব্যাখ্যা। কোরআন পাকের সূরা-ই-লোকমানে তাই ***"সাখ্যারালাকুম মাফিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদে, এই বাণীতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, আসমান জমিনে যা কিছু আছে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি"***। অতএব হযরত আদম (আ.) সেজদা বা আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছেন। কবি তাই বলেন:

"দেখিতে চাও যদি খোদার রহস্য
মানব আকৃতিতে দেখ উজ্জ্বল বিকশিত"। (১০)

আভিধানিকভাবে 'আদম' শব্দটির অর্থ ইমাম বা সর্দার (নেতা), এই কথার আরো অর্থ হচ্ছে মাটির কঠিন স্তর দিয়ে সৃষ্ট মানব, যিনি সর্দারি বা নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য। এ কারণে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, ***"খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরতেহি"***। অর্থাৎ আল্লাহ্ আদমকে নিজ অবয়বতায় (নিজ পবিত্র আদলের অনুরূপ করে) সৃষ্টি করেছেন। এই বর্ণনার আলোকে বুঝা যাচ্ছে, উপাস্যের অদৃশ্য প্রকৃতি ও দৃশ্য আকৃতির নাম 'আদম'। বিষয়টির একটি উপমা বা তুলনা এভাবে দেয়া চলে যে, একটি গাছ ও ঐ গাছের বীজ (বৃক্ষ ও তার বিচি), অর্থাৎ একটি অদৃশ্য বীজ থেকে যেমন রূপান্তরের মাধ্যমে একটি গাছ বা বৃক্ষের দৃশ্যমান হওয়া বা পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করা বা গাছ রূপে বেড়ে উঠা। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, ***"মানুষ আমার রহস্য আমি মানুষের রহস্য"***। (১১) [প্রাসঙ্গিক সূত্র: অধিকতরো জানতে হলে দেখুন, *আয়না-ই-বারি*, বাহরুল উলুম মওলানা আবদুল গণি (র.) এবং *ফসুস-উল-হেকম* , হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবি (র.)] মহান আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন শরিফে বলছেন: ***"যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা করো, শয়তান ছাড়া সবাই তা করলো। শয়তান অস্বীকার করলো ও অহঙ্কার করলো; যেহেতু সে নাফরমান ছিলো"***। (১২) (*আল কোরআন*, সূরা বাকারা: আয়াত ৩৪)। অতএব পরিষ্কার বুঝা যায়, অহঙ্কার বিবর্জিত বিনয়ের নামও সেজদা। এই আয়াতে ফেরেশতাগণই সেজদার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন বলে দেখা যাচ্ছে। ইবলিস ফেরেশতা ছিলো না, ইবলিস আগুন থেকে এবং ফেরেশতা নূর (আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পবিত্র জ্যোতিঃ) থেকে সৃষ্ট।

উসুল (মূলনীতি) অনুসারে হকিকত বা মূল (পরম সত্য) পরিবর্তন হয় না। যেমন আম গাছ কখনো কাঁঠাল গাছ হয় না, ছাগল কখনো গরু হয় না, এখানেও সেটাই সত্য। কাজেই মেনে নিতে হয় উপরে বর্ণিত আগুন ও নূর, মানবীয় সত্তার তমঃ (অন্ধকার) ও রজঃ (প্রকৃতির গুণ, উদ্যম সৃষ্টিকারী সৎ গুণ) নামের দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব। জিন বা শয়তান কখনো ফেরেশতা হতে পারে না, এবং ফেরেশতাও কখনো জিন হতে পারে না। এতএব এটা ব্যক্তি পর্যায়ের নির্দেশ নয় বরং এটা আদমের প্রবৃত্তি পর্যায়ের নির্দেশ। (১৩) প্রথমটি অর্থাৎ ইবলিস মানব জ্ঞানের অনুগত নয় বরং মানব জ্ঞানের উপর প্রভাবশালী ও বিপথে পরিচালনাকারী, যেমনঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ফেরেশতা বা নূরানি শক্তি মানবজ্ঞানের অনুগত ও সাহায্যকারী। যেমনঃ দয়া-দাক্ষিণ্য, ভালবাসা ইত্যাদি প্রেমজ প্রকৃতি সমূহ যা মানবকে সুপথে পরিচালিত করে।

এই আদি সৃষ্টি নূর ও পরবর্তী সৃষ্টি আগুন, তৃতীয় সৃষ্টি স্থূলদেহী মানবে সঞ্চিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে মানবের উপর প্রভাবশালী হয়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি প্রবৃত্তিনিচয় (মানবপ্রবৃত্তি সমূহ) জাগ্রত হলে জ্ঞান বা মানবতার অবাধ্যতাপূর্ণ উত্তেজনামূলক ভাবের বিকাশ ঘটে; অন্যদিকে দয়া-দাক্ষিণ্য, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল গুণ সমূহ জাগ্রত হলে মানবতার উৎকর্ষকারী অনুগত ভাবের প্রকাশ পায়।

মানবশ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিঃ

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খোদায়ী ফজিলতের (শ্রেষ্ঠত্ব বা মাহাত্ম্য) মাধ্যমেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। খোদা পরিচিতিজ্ঞান অর্জনের জন্য এটা একান্ত প্রয়োজন। স্রষ্টা অনুরাগ ও সৃষ্টি অনুরাগের মাঝখানেই এটার স্থিতি বা অবস্থান। সৃষ্টি অনুরাগ মরীচিকার মতো ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর, এই অনুরাগ মানবকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলে। আবার অন্যদিকে স্রষ্টা অনুরাগ মানবকে বিভ্রান্তি ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেয় এবং তার আসল গন্তব্যস্থল (লক্ষ্যবস্তু) মহান স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে দেয়।

প্রবৃত্তির কবলে পড়ে যখন আদি মানব হযরত আদম (আ.) পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছিলেন, তখন বিপদগ্রস্ত আদম (আ.) ত্রাণকর্তা খোদার বাণী পেলেন : ***"আমার পক্ষ থেকে যেই হেদায়েত বা সুশিক্ষা আসবে, তার অনুগামীদের জন্য কোনো ভয়-ভীতি নেই।"*** (১৪) (*আল কোরআন*, সূরা বাকারাঃ আয়াত ৩৮)। আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (র.) *মসনবি*-তে বলেন : ***"আদম, প্রবৃত্তির আস্বাদ গ্রহণে যখন এক পা বাড়িয়েছিলেন, তখন এই প্রশস্ত (বিস্তীর্ণ) দুনিয়া তাঁর গলার হার-এ (কণ্ঠাভরণ, মালা) পরিণত হলো।"*** (১৫)

মানবের জ্ঞানের স্তরঃ

মানবজ্ঞানের তারতম্য অনুসারে খোদায়ী হেদায়েত তিন ভাবে মানবের আয়ত্তে আসে। যেমনঃ ***আক্‌লে মা'য়াশ***, ***আক্‌লে মা'য়াদ*** এবং ***আক্‌লে কুল্লি*** বা ***কুদসি***।

আক্‌লে মা'য়াশঃ

এটা খাদ্যপ্রেরণা থেকে উৎপন্ন হয়। এটাকে মাওয়ালিদে সালাসা বা স্থূলজগতের প্রেরণাজনিত ত্রিবিধ জড়ধর্মে প্রভাবান্বিত বুদ্ধিও বলা যেতে পারে। সুফি পরিভাষা অনুসারে এটাকে 'তাকাজায়ে নফ্‌স' বা কামনা প্রবৃত্তি বলে অভিহিত করা হয়। খাও, পান করো, ঘুমাও, স্ফূর্তি করো, সহবাস ইত্যাদি এর স্বভাব। এরকমভাবে হিতাহিত চিন্তাবিবর্জিত উপস্থিত কামনা চরিতার্থের জন্য যে প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তাকে নাসুতি বা দৃশ্যমান জগতের প্রেরণা বা আক্‌লে মা'য়াশ বলে। এর জন্য 'ওরূদ' বা আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে অবতীর্ণ ধর্ম হলো শরিয়ত বা বিধানগত ধর্ম।

এই নাসুতি স্তরের লোকদের জন্য ঈমান বা বিশ্বাস, একরার বা স্বীকার এবং আমল (বিশ্বাসের সাথে চর্চা), আরকান (মৌলিক নীতি) ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসারে কাজ করার প্রয়োজন আছে। এ কারণে তাদের জন্য সর্দার (নেতা) বা নবীর প্রয়োজন অপরিহার্য। এটা তবলিগ বা প্রচারমূলক বিষয়। এর খোদায়ী প্রচারকারীকে নবী এবং অনুসারীকে উম্মত বলে। (*তফসির-ই-হোসাইনী* পৃ. ১৫৭, *তফসির-ই-ইবনে আরাবি* পৃ. ১০০, *আল কোরআন* সূরা আল আন্‌আমঃ আয়াত ৩৮)। (১৬) আক্‌লে মা'য়াশ স্তরে খোদাতায়ালার 'ইসমে কাহ্‌হার' নামের বিকাশ হচ্ছে (ঐ নাম বিরাজমান)। (১৭)

আক্‌লে মা'য়াদঃ

এটি নিজ কর্মের পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে প্রেরণা দান করে এবং স্রষ্টার সৃষ্টিতে বা নিজ সত্তার মধ্যে চিন্তা বা 'তেলাওয়াতে-ই-অজুদ' দ্বারা খোদার অনুগ্রহ লাভে সহায়তা করে। এই চিন্তাধারাকে 'লওয়ামা' (মহান খোদার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ) এবং এই স্তরকে 'মলকুত' (ফেরেশতাগণের স্তর) বলে। এটি অন্তর জগতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এই স্তরের জিকরে জবানীকে (মৌখিক জপ বা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে খোদাকে স্মরণ) জিকরে নাসুতি এবং জিকরে কল্‌বি-কে (অন্তর বা হৃদয়ের মাধ্যমে খোদার স্মরণকে) জিকরে মলকুতি বলা হয়। এই স্তরের মনোভাবকে 'খাতের-ই-রহমানি' (দয়ামত খোদার সম্মানে একাগ্র) বলা হয়।

'রহমান' খোদার রহমতপূর্ণ আদি ও গুপ্ত নাম। পবিত্র কোরআন পাকে বর্ণনা আছে, 'রহমান, রহমত পরিপূর্ণ গুণান্বিত অবস্থায় নিজ আসনে উপবিষ্ট' (১৮) সৃষ্টির আগে সৃষ্ট জীবের জন্য আবশ্যকীয় বস্তুর মজুদকারীর (স্রষ্টার) গুপ্ত গুণবাচক নাম 'রহমান' (পরম দয়াময়)। যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ

হওয়ার আগে মায়ের স্তনে দুধের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। সৃষ্টির পর সৃষ্ট জীবের কৃতকর্মের ফল হিসাবে স্রষ্টা থেকে সৃষ্টির কাছে দান হিসাবে যা আসে, সেসব দানের দাতার (স্রষ্টার) গুণজ নামের প্রকাশ 'রহিম'। যেমন বলা যায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের স্নেহে ও সন্তানের দুধ পানের আগ্রহের ফলে স্রষ্টার যে দান সৃষ্টজীবে অর্পিত হয় তাই হলো 'রহিমি' গুণবাচক প্রকৃতির বিকাশ।

এই দুই নামের মাধ্যমে জগতের আবর্তন-বিবর্তন ও ক্রমবিকাশাদি সংঘটিত হয়। তাই কোরআন পাকের প্রত্যেক 'সূরা'র প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম' লেখা দেখা যায়। আক্‌লে মা'য়াদ বা গভীর ধ্যানের মাধ্যমে অর্জিত খোদাতায়ালার অনুগ্রহ, আর বাইরের প্রভাবমুক্ত নিজ হিতচিত্তে বিভোর অবস্থায় স্রষ্টা কর্তৃক অর্পিত অনুগ্রহের নামই 'এলহাম' (মুত্তাকির হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে যে বরকতপূর্ণ ইঙ্গিত বা কথা ঢেলে দেয়া হয়)। পবিত্র কোরআন পাকে উল্লেখ আছে: ***"প্রত্যেকে আত্ম উন্নতি ও প্রশংসা সম্বন্ধে সজাগ।"*** (১৯) যেমন, কীটাণু আত্মচিত্ত-বিভোর সাধনায় গুটিতে খোলস পরিবর্তন করে ও সজীব চেতনাশক্তিতে স্বরূপে বিরাজ করে। যেমন দেখা যায়, মুরগি ডিমে প্রয়োজনীয় মাত্রায় তা' দিয়ে নিখুঁত পদ্ধতিতে ছানা ফুটাতে অভ্যস্ত। জীবাণু বিভিন্ন যোনিতে বা সাধনাগারে নিঝুম সাধনাকাল অতিবাহিত করার পর সচেতন রূপবিশিষ্ট প্রাণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং মৃত্যুর পর পূর্ব-প্রকৃতির সময় অর্জিত আকৃতি বা ভৌতিক দেহকে (স্থূল শরীরকে) খোলসরূপে ধাঁধা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে রেখে আত্মগোপন করে। অন্যদিকে সজীব চেতনাশক্তি বহুদূরে চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকে। যার নাম 'আয়ান-ই-সাবেতা' বা হাকিকতের (পরম সত্যের) প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এবিষয়টির অর্থ হলো, নিজ সত্তাতে বিকশিত খোদায়ী শক্তিবলে প্রত্যেকে বুঝতে পারে, নিজের আত্মবিকাশের জন্য মঙ্গলকামনা কী? এবং প্রশংসাই বা কী? সুতরাং বিভিন্ন সত্তার বিভিন্ন কর্মপ্রেরণাই তাদের বিকাশের প্রেরণা বা বাস্তব প্রকাশভঙ্গী। যার সম্পর্কে মহান স্রষ্টা নিশ্চিতভাবে অবগত। যেহেতু স্রষ্টা সমস্ত শক্তির মূলাধার। স্রষ্টার দিকেই সৃষ্টি প্রত্যাবর্তনশীল। পারিপার্শ্বিক যুগের চাহিদা ও সৃষ্টির কামনা অনুসারে সত্তা বা 'এস্তেহ্‌কাক-ই-অজুদি' বারবার বিকাশ লাভ করে। কোরআন পাকের সূরায়ে নূর-এর আয়াত ৪১/৪২-এর ভাবার্থ:

"মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমার মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারি ফুল ক্ষেত্র।"

এখানেই মানববুদ্ধির বিভ্রান্তি ঘটতে দেখা যায়। যারা খোলসকে আসল মনে করে বসে থাকে, তারাই ধোঁকায় পড়ে যায়। এই সচেতন প্রাণকেন্দ্রে খোদায়ী শক্তির সন্ধান নিতে যারা সমর্থ হয়, তারাই ভাগ্যবান ও প্রকৃত খোদায়ী শক্তির সন্ধানকারী সাব্যস্ত হয়। এভাবে যারা সত্য অভিমুখে ধাপে ধাপে অগ্রগতির ধারায় পা বাড়াতে সমর্থ হয়, তারাই সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য বিশ্বসাম্য এবং স্বরূপে আবর্তন করতে অভ্যস্ত হয় সেই সাথে তাদের সামর্থ্য এই আবর্তনকে তাদের জন্য সহজসাধ্য করে তোলে। এই প্রসঙ্গে কবির উক্তি: ***"এটা আমার কাছে অত্যন্ত মনঃপূত বাণী যে, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক সৃষ্টিকে এক একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"*** (২০)

আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (র.) বলেন: ক) ***"আমি সাতশ' সত্তরটি দেহ আবরণ দেখেছি (জ্ঞানের ক্রমোন্নতির স্তরকে অবলোকন করেছি)। তৃণবৎ বার বার উত্থিত হয়েছি।" (২১)*** খ) ***"আমি সব সম্প্রদায়ের সাথে কান্না-গীতি গেয়েছি এবং উন্নত ও অবনত স্তরের জনগণের সঙ্গে মিশেছি।" (২২)*** যা সত্তা (যাকে সত্তা বলা হয়)। গ) ***"প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়াল মতো আমার বন্ধু হয়েছে, কিন্তু আমার অন্তর্নিহিত রহস্য বা বাস্তবতাকে কেউই তালাশ করেনি।"*** (২৩) যা মানবতা (যাকে মানবতা বলা হয়)।

উপরোক্ত বিষয়গুলো 'ইসমে রহমান'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যাকে বলা যায়, সত্য এবং অবিনশ্বর চেতনা।

সারানুবাদ: ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. হাদিস শরিফ, "মূতু কব্‌লা আন তমূতু"
২. *মসনবি* শরিফ, আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (র.)
৩. কোরআন শরিফ, সূরা: নাযি'আত
৪. আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (র.)
৫. হাফেজ সিরাজি (র.)
৬. গাউসুল আযম হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)
৭. *দিওয়ান-ই-আলী*, হযরত আলী (রা.)

সহায়ক গ্রন্থ:

ক. ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী অনূদিত *'BELAYET-E-MUTLAKA' (The Unchained Divine Relations or Unhindered Spiritual Love of God)'*, ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭, প্রকাশনী: আঞ্জুমান-ই-মুত্তাবেয়িন-ই-গাউস-ই-মাইজভাণ্ডারী, চট্টগ্রাম।

খ. *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, সংকলন ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ হারুন রশিদ, প্রথম প্রকাশ: জৈষ্ঠ্য ১৪২২/ মে ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বাংলাদেশ।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)

মোঃ গোলাম রসুল

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) মহানবী (দ.)-এর নবুয়ত প্রকাশের সাত বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু সুফিয়ান এবং মাতার নাম সুফিয়া বিনতে আবিল আছ। প্রকৃত নাম নামলা। কুনিয়াত উম্মে হাবিবা। তাঁর নসবনামা হলো উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান বিন হারব উমাইয়া বিন আবদি শাম্‌স। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলতে চায় সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাঁরা অতীত হয়ে গিয়েছেন। কারণ তাঁরা হলেন হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর সাহাবা (রা.)। কারণ তাঁরা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁদের অন্তর ছিলো অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁদের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিলো না। আল্লাহ্'তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁদেরকে বাছাই করেছিলেন। অতএব, তাঁদের সম্মান স্বীকার করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁদের আখলাক ও আদর্শ মজবুত করে ধরো। কারণ তাঁরা হেদায়তের উপর ছিলো।" হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে হয়েছিলো। স্বামী-স্ত্রী দুজনই নবুয়ত প্রকাশের প্রথম যুগে একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) এর পিতা সে সময় পর্যন্ত ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলমানদের উপর নির্যাতন করেছিলেন। বস্তুত রাসূলে করীম (দ.) যখন মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দেন, তখন উবাইদুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং হযরত হাবিবা (রা.) অন্যান্য মুসলমানদের সাথে হিজরত করে হাবশা গমন করেন। হাবশা পৌঁছার কিছুদিন পর উবাইদুল্লাহ মুরতাদ হয়ে যায় এবং খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মদ পান করতে থাকে। হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) স্বামীকে অনেক বুঝালেন, কেন নিজের পরকাল নষ্ট করছো? কিন্তু আল্লাহ্ তার অন্তরের উপর সীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ কথায় কোন ফল হলো না এবং সে খ্রিষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। পবিত্র কুরআনে সূরা নূর-এর ৫৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করেন "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ববান করবেন, যেমন তিনি কর্তৃত্ববান করেছিলেন পূর্বসূরিদের। আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত ধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাদের বর্তমান অনিশ্চয়তা দূর করে নিরাপত্তা ও শান্তি সমৃদ্ধি প্রদান করবেন। বিশ্বাসীরা শুধু আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যদি কেউ বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয় সে নিঃসন্দেহে সত্যত্যাগী"। উবাইদুল্লাহ্‌র ঔরসেই হযরত উম্মে হাবিবা নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনিও সাহাবী ছিলেন। তাঁর নামের নিসবতেই হযরত রামলার (রা.) কুনিয়ত উম্মে হাবিবা (রা.) নামে মশহুর হয়ে যান।

বিদেশ বিভূঁইয়ে অবস্থানকালে হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) বিধবা হয়েছিলেন। ইদ্দত পুরো হওয়ার পর নবী করীম (দ.) হযরত আমর বিন উমাইয়া জামরী (রা.) কে হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তিনি নবী করীম (দ.) এর পক্ষ থেকে উম্মে হাবিবা (রা.) এর বিয়ের পয়গাম হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর কাছে পৌঁছে দেন। বিয়ের এ পয়গাম পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ বাঁদীকে রৌপ্যের দুটি চুড়ি এবং আংটি দান করেছিলেন এবং হযরত খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আছ (রা.) কে নিজের উকিল নিয়োগ করেছিলেন। সন্ধ্যায় নাজ্জাশী হযরত জাফর বিন আবু তালেব (রা.) কে এবং অন্যান্য মুসলমানকে ডেকে নিজে উম্মে হাবিবার বিয়ে পড়িয়ে দেন। বিয়ের প্রথা সমাপনান্তে হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রা.) সবাইকে খাবার খাইয়ে বিদায় করেছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পর হযরত হাবিবা (রা.) হাবশা থেকে মদীনা আগমন করেন। নবী করীম (দ.) এ সময় খায়বরের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। এটা ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকের অথবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকের ঘটনা ।

মহান আল্লাহ্ সূরা-নিসার ১ নং আয়াতে বলেন, "হে মানুষ! সচেতন হও তোমার প্রতিপালকের মহিমা সম্পর্কে! যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি সেই ব্যক্তি থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তাদের দুজন থেকে অসংখ্য নর-নারী জমিনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা সচেতন হও, সেই আল্লাহ্‌র, যার নামে তোমরা পরস্পরের

কাছে অধিকার দাবী করো। যত্নশীল হও জ্ঞাতিবন্ধন রক্ষায়। নিশ্চিত জেনো, তোমরা আল্লাহ্‌র তীক্ষ্ণ নজরদারির মধ্যেই রয়েছো।"

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) অত্যন্ত উত্তম স্বভাবের মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীর মর্যাদা দান করেছেন।

বাস্তবতঃ তাঁর পিতা মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কার কোরাইশদের নেতৃত্ব দেন। হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) ইসলামের জন্য দীর্ঘ সফরের দুঃখ-কষ্ট হাসি মুখে বরণ করেন এবং হাবশার একাকীত্ব জীবনও বরণ করেন। অথচ বিত্ত-বৈভব ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে কোরাইশদের মধ্যে তাঁর পরিবারও প্রসিদ্ধ ছিল।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাঁর পিতা একবার তাঁর সাথে দেখা করার জন্য মদীনা আগমন করেন। এ আগমনের হেতু এও ছিলো যে, নিজের কন্যার মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়সীমা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো। যখন তিনি রাসূল (দ.)-এর বিছানার ওপর বসতে উদ্যত হলেন, তখন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) বিছানা উল্টে দিলেন। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত মনোকষ্ট পেলেন এবং বললেন, "তুমি এ বিছানায় নিজের পিতাকেও বসা পছন্দ করো না।" হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) বললেন, "একজন মুশরিক রাসূলে পাক (দ.) এর পবিত্র বিছানায় বসুক অবশ্যই আমি তা পছন্দ করি না।" আবু সুফিয়ান এ কথা শুনে ক্ষোভ চেপে এতটুকু বললেন, "তুমি আমার প্রতি খুব বেশি বিগড়ে গেছো।"

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) খুব সুদর্শন মহিলা ছিলেন। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) নিজের কন্যার রূপের গৌরব প্রকাশ করতেন। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলে করীম (দ.) বললেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ১২ রাকাত নফল নামায পড়বে, জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরী করা হবে।" এ কথা উম্মে হাবিবা (রা.) শুনেছিলেন। এরপর সারা জীবন ১২ রাকাত নফল নামায প্রতিদিন তিনি অত্যন্ত নিয়ম মাফিক আদায় করতেন। যখন তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (রা.) ইন্তিকাল করেন তখন তিনদিন পর খোশবু চেয়ে গণ্ড এবং বাহুতে লাগালেন এবং বললেন, "রাসূলে করীম (দ.)-এর নির্দেশ হলো, ঈমানদার মহিলার কারোর জন্য তিনদিনের বেশি শোক পালন করা জায়েজ নেই। শুধুমাত্র সে স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০দিন শোক পালন করবে।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) ৪৪ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। ওফাতের পূর্বে তিনি হযরত আয়েশা (রা.) কে ডাকলেন এবং বললেন, "আমার এবং আপনার মধ্যে সতীনের সম্পর্ক ছিলো। আমি যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন।" হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, "আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।" অত:পর তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

অতপর হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) বললেন, "আপনি আমাকে খুশি করেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে খুশি রাখুন"।

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) থেকে ৬৫ টি হাদিস বর্ণিত আছে। এসব হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ও তাবেয়ী রয়েছেন।

সূত্র:

১। কুরআন শরিফ,

২। ২৩১ জন মহিলা সাহাবী ও বেহেশ্‌তী রমনীগণ, মোসাম্মৎ আমেনা বেগম, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১১০০।

৩। হায়াতুস সাহাবাহ্, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব, কান্দলবী (রহ.), দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

সুফি উদ্ধৃতি

- আরেফ লোকেরা আল্লাহ্‌তা'য়ালার দরবারের দিকে মনে প্রাণে ঝুঁকে পড়েছে। আল্লাহ্‌পাক তাঁদের স্বীয় সান্নিধ্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আবেদগণ আল্লাহ্‌তা'য়ালার ইবাদতে মশগুল হয়েছেন। আল্লাহ্‌পাক তাদের স্বীয় নৈকট্য দান করেছেন। অন্যান্য লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। আল্লাহ্‌পাক তাদের হেকমত দান করেছেন।
- এক বছরে যদি চোখ হতে এক বিন্দু অশ্রু নির্গত হয় যা খাঁটি আল্লাহ্‌তা'য়ালার জন্য নির্গত হয়েছে, তবে এটাই যথেষ্ট।

-----হযরত সুফইয়ান সাওরী (রহ.)

আহলে বাইতে রাসূল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ

অধ্যাপক জহুর উল আলম

মওলা আলী মুশকিল কোশা (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াযহাহু)

প্রখ্যাত তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব, বিশ্বনবী (দ.)'র অন্যতম জীবনী লেখক হযরত শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহ.)'র মাদারেজুন নবুওয়াত ৫ম খন্ডে বর্ণিত আছে 'খতিব বাগদাদী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্ (দ.) যখন হযরত ফাতিমা (রা.) কে হযরত আলী (ক.)'র সঙ্গে বিবাহ দেন, তখন তিনি কেঁদে ফেলেন। বিশ্বনবী (দ.) কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে বলেন, 'হে আমার কলিজার টুকরা! কাঁদছো কেন?' হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপনি আমাকে এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন, যে বিত্তহীন।" হুজুর (দ.) বলেন, ''ফাতিমা! তুমি কি এ কথা জেনে তুষ্ট হবে না যে, আল্লাহ্'তায়ালা সারা পৃথিবীতে দু'জনকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। তাদের মধ্যে একজন তোমার পিতা, পরের জন তোমার স্বামী।" উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, রাসুল (দ.)'র দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা.)'র স্বামী হলেন বেলায়তের সম্রাট, জ্ঞানের মহানগরী, বিশ্বনবী (দ.)'র ইলমের প্রবেশদ্বার হযরত আলী হায়দার (ক.)। স্বামী সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা.)'র প্রাথমিক অভিমত হযরত আলী (ক.) বিত্তহীন। পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গী এবং বস্তুনিষ্ঠ অর্থে বিষয়টি সত্য।

হযরত আলী ভূমিষ্ঠ হন পবিত্র কাবাগৃহে। বিশ্বনবী (দ.) তখন কাবাগৃহের নিকটে অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে হুজুর (দ.) তাঁর চাচী ফাতিমার নিকট গমন করেন। নবজাতক আলীকে হুজুর (দ.) এক নজর প্রত্যক্ষ করেন। আলীও পৃথিবীতে এসে চোখ দিয়ে প্রথম নজর করেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র চির জ্যোতিষ্মান পবিত্র মুখমণ্ডলের প্রতি। অতপর হযরত আলী পৃথিবীর বুকে মাতৃস্তন্য গ্রহণের পূর্বে বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র জিহ্বা চুষে মধুময় লালাকেই প্রথম খাবার হিসেবে গ্রহণ করেন। শিশু আলী, কিশোর আলী সর্বাবস্থায় ছিলেন বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র নজরে। পিতা আবু তালিবের গৃহে অনেক সদস্য। তুলনামূলকভাবে পারিবারিকভাবে আয় উপার্জন হয়ে পড়েছিল সীমাবদ্ধ। অথচ আবু তালিব হলেন কাবাগৃহের প্রধান সেবায়েত এবং কোরাইশ সর্দার। আবু তালিবের মান মর্যাদা, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি অপরিসীম। মক্কার সবাই তাঁকে সমীহ করেন। বিশ্বনবী (দ.) লক্ষ্য করেন চাচা আবু তালিবের সামাজিক মর্যাদা এবং প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। তাই তিনি হযরত আলী (ক.) কে প্রতিপালনের দায়িত্ব নেন। অর্থাৎ শৈশবেই হযরত আলী (ক.) হলেন বিশ্বনবী (দ.)'র পারিবারিক সদস্য। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) হলেন হযরত আলী (ক.)'র একান্ত অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক। হযরত আলী (ক.) শৈশব থেকেই বিশ্বনবী (দ.)'র একান্ত অনুগামী-অনুসারী। তাই নবুয়ত প্রকাশের পর বিশ্বনবী (দ.)'র ইবাদতের প্রকৃতি লক্ষ্য করে হযরত আলী তাঁকে অনুশীলন করতে থাকেন। এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.)'র প্রতি বিশ্বনবী (দ.)'র পক্ষ থেকে কোন প্রকার নৈতিক বা মানসিক চাপ ছিল না। হযরত আলী (ক.)'র জীবনে পরম ধার্মিকতা, অবিরাম জ্ঞান চর্চা, অহর্নিশ সাধনা তথা তপস্যা, অসীম সাহসিকতা সবকিছুর মূলে রয়েছে রাসূলে করীম (দ.)'র সঙ্গে পারিবারিক পরিমণ্ডলে সার্বক্ষণিক অবস্থান এবং তাঁকে অনুশীলনের সদা সচেতন ও সচেষ্ট থাকা। হযরত আলী (ক.)'র চরিত্রে দৃশ্যমান দূর্বার বিক্রম, কমনীয় সুষমা এবং ঔদার্য ও ভক্তির অনুপম আনুগত্য সবই বিশ্বনবী (দ.) কে অনুশীলনেরই প্রতিবিম্ব।

বিশ্বনবী (দ.) প্রকাশ্যে পারিবারিক পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হন। আবদুল মোত্তালিবের আওলাদদের আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জনিত বিশ্বনবী (দ.)'র আবেদন শুনে বিরাগ হয়ে কিশোর হযরত আলী (ক.) ব্যতীত সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আলী এ সমাবেশে প্রকাশ্যেই হুজুর (দ.)'র প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেন।

বিশ্বনবী (দ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের রাতে স্বীয় গৃহে নিজ বিছানায় নবীর পবিত্র চাদরাবৃতাবস্থায় রেখে যান হযরত আলী (ক.) কে। উদ্দেশ্য দুটি, ১. নবীর গৃহ ঘিরে রাখা সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের তমশাবৃত রেখে নিরাপদে বিশ্বনবী (দ.)'র হিজরত সম্পন্ন করা, ২. 'আল আমীন' হিসেবে মক্কাবাসী কর্তৃক তাঁর নিকট আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখা সম্পদ নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট ফেরত দেয়া। প্রথম কাজটি ছিল হযরত আলী (ক.)'র জীবনের জন্যে সার্বিক অর্থে ঝুঁকিপূর্ণ। দুর্বৃত্তরা চাদর না সরিয়ে আক্রমণ করে বসলে মৃত্যু

ছিল অবধারিত। তাছাড়া বিশ্বনবী (দ.) কে না পেয়ে বেপরোয়া হয়ে দুর্বৃত্তরা হযরত আলীকেও আহত-হত্যা করতে পারতো। দুর্বৃত্তরা রাসূল (দ.)'র বিছানায় চাদর মুড়িয়ে থাকা আলীকে দেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিশ্বনবী (দ.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বিন্দু পরিমাণ শংকিত না হয়ে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে তাদের জানালেন "তোমরা তো আমাকে এখানে পাহারাদার বসাও নি, আর আমি তোমাদের হুকুমের তাবেদার নই। আমি কি করে বলবো উনি কোথায়?" হযরত আলী সহসা হযরত মুহাম্মদ (দ.) সমীপে আমানত হিসেবে রক্ষিত শত্রু-মিত্র সকলের সম্পদ যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিয়ে তিনদিন পর দ্রুত মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। কয়েকদিন বিশ্বনবী (দ.)'র সঙ্গে হযরত আলী (ক.)'র সরাসরি দেখা নেই। আলাপ নেই। নবী (দ.)'র প্রেমকাতরে আলী (ক.)'র মনে তখন প্রেম উদ্দীপনা। সহসা মদিনা পৌঁছাতে হবে। শত্রুর ভয়ে আলীকেও অতি সংগোপনে মক্কা ত্যাগ করতে হচ্ছে। দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে পথ অতিক্রম। তিন'শ মাইল পথ অতিক্রম করতে তাঁর লেগে যায় এগার দিন। একটানা রাতের আঁধারে এগার দিন হাঁটা। অন্ধকারে পাথরে-কঙ্করে টোক্কর খেয়ে খেয়েই পথ চলা। অভুক্ত-অর্ধভুক্ত অবস্থায় ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত পদ যুগল নিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র পদ প্রান্তে অবশেষে হযরত আলী (ক.) উপস্থিত। পরম মমতায় বিশ্বনবী (দ.) হযরত আলী (ক.)'র সর্বদেহে পবিত্র হস্ত বুলিয়ে দেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরে রাখেন অনেকক্ষণ। মুহূর্তে হযরত আলী (ক.)'র অবসাদ-ক্লান্তি যেন নি:শেষ হয়ে যায়। নতুন জায়গায় আবারো ঝাঁপিয়ে পড়েন তাওহীদ প্রচারে। উল্লেখ্য যে, মক্কা-মদীনার দীর্ঘপথ অতিক্রম কালে হযরত আলী'র নিকট ঢাল-তলোয়ার এবং পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত অন্যকোন সম্পদ সম্বল ছিলনা। এক কথায় আলী মদীনায় প্রবেশ করার কালে ছিলেন বিত্তহীন। অথচ আলী তখনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাহীন প্রশান্ত চিত্তের দৃঢ় মনোবলের করিৎকর্মা তৎপর উদার প্রাণ মহাযুবক।

মদিনা জীবনে হযরত আলী (ক.) প্রথম দিন থেকেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র আশ্রয়ে অবস্থান করে ইসলাম প্রচারের কাজে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আনসার-মুহাজিরদের মধ্যেই ভ্রাতৃসম্পর্ককালে বিশ্বনবী (দ.) হযরত আলী (ক.)কে নিজের সঙ্গে রেখে দেন। মক্কায় হযরত আলী যেমন নবী পরিবারের সদস্য হিসেবে বেড়ে ওঠেছেন, তেমনি মদিনাতেও আলী হলেন নবী পরিবারের সদস্য । মদিনা জীবনে হযরত আলী (ক.) কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। গৃহে এবং মসজিদে নববীতে হুজুর (দ.)'র আদব আখলাক, ওহী এবং বিভিন্ন হিতোপদেশ পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ করতেন হযরত আলী। এ সময় প্রায়শ তিনি মসজিদে নববীতে রাত অতিবাহিত করতেন। তিনি এতো নিঃসম্বল ছিলেন যে, বিশ্রামের জন্যে বিছানার আবশ্যকতাও প্রয়োজন মনে করতেন না। আসলে তাঁর এ ধরনের জীবনযাপন তাসাওউফ সাধনার এক অনন্য দিক।

মদিনা জীবনে হযরত আলী শুধু সাধনা জগতে নিজেকে সক্রিয় রাখেননি বরং প্রতিটি জিহাদে তিনি ছিলেন জগৎ বিখ্যাত যোদ্ধার এক অতুলনীয় উপমা। বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধসহ প্রতিটি জিহাদে ইসলামের শত্রু হননে এবং আল্লাহু আকবর ধ্বনির হায়দারী হাঁকে প্রতিটি রণ প্রান্তরে শাহাদতের প্রাণান্তকর উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো আলীর কণ্ঠে। খায়বরের দুর্ভেদ্য কামুস দূর্গের পতন ঘটাতে তিনি নিযুক্ত হলেন আল্লাহ্ এবং রাসুলের অতি পছন্দকৃত প্রিয়ভাজন সেনাপতি। কামুস দূর্গ অধিকারকালে ঢাল হস্তচ্যুত হলে তিনি ফটকের প্রধান লৌহ কপাট খুলে নিয়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন এবং যুদ্ধ শেষে কপাটটি এতো জোড়ে নিক্ষেপ করেছিলেন যে বিশাল আকৃতির ভারী কপাট অনেক দূরে পড়ে থাকে। পরবর্তীতে এই কপাট পুনঃস্থাপনের জন্যে চল্লিশজন শক্তিমান যুবক গিয়েও তুলে আনতে সক্ষম হননি। খায়বরের যুদ্ধে হযরত আলী খোদায়ী শক্তিতে এতোই মদদপ্রাপ্ত ছিলেন যে, পৃথিবীর তামাম রণাঙ্গনের ইতিহাসে দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। এখনো মুসলিম জনমানসে শক্তি প্রয়োগের যে কোন কার্য সাধনে শতমুখে উচ্চারিত হয় 'ইয়া আলী' রব। খায়বরের ঘটনা প্রবাহ এবং রণ বীরত্ব নিয়ে বাংলা পুঁথি সাহিত্যে মহাকাব্যের আদলে রচিত হয়েছে "খায়বরের জঙ্গনামা"। যে কোন জিহাদে লক্ষ্য করা গেছে আলীর জুলফিকারের সম্মুখীন হওয়া মানে শত্রুর মৃত্যু অনিবার্য। যে কোন রণক্ষেত্রে আলীর উপস্থিতি মানে বিজয় অবধারিত। এই অসীম সাহসী রণবীর শত্রু নিধনে নিঃশঙ্ক এবং অকুতোভয় আলীকে দেখা গেছে উন্মুক্ত জুলফিকার নিয়ে পরাজিত ভূপাতিত শত্রুর বুকে চেপে বসেছেন শিরোচ্ছেদের জন্য, বেদিশা হয়ে শত্রু থুথু নিক্ষেপ করলেন আলীর তেজোদ্দীপ্ত পবিত্র মুখমন্ডলে, মহাবীরের প্রাণসংহারী শক্তি এবং জিহাদের জোশ নিমিষেই শান্ত এবং করুণায় নিমজ্জিত হল। এটিই মহাত্মা মওলা আলীর তাকওয়া,

এটিই তাঁর তাসাওউফ জগৎ-বেলায়েত সম্রাটের অনিবার্য অক্ষয় ক্ষমতা, যা মুহূর্তেই জজবা হাল এবং নিমিষেই প্রেমময়তার প্রশান্ত রূপ ধারণ করে। জীবনে কোন যুদ্ধে হযরত আলী (ক.) হারেননি। ইসলামের বিজয় পতাকা তিনি সব সময় সমুন্নত রেখেছেন। তাঁর জীবনে যে সব যুদ্ধ ও ঘটনা পরাজয় বলে কোন কোন ঐতিহাসিক এমনকি কোন কোন ফকিহ্ উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন তা ঘটেছে স্রেফ শঠতা, প্রতারণা, মুনাফিকী আর গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মতো অধার্মিক-অনৈতিক কারণে। এ ধরনের হীন কার্যকলাপে নিজের মানসপটকে বিন্দু পরিমাণ সংযুক্ত করে ঈমান, আখলাক, বীরত্ব এবং আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পন জনিত সততা, হক এবং ইহসানের সুউচ্চমার্গীয় অবস্থানে কালিমা লেপন করেন নি। হযরত আলী (ক.)'র নিকট জিহাদ বা যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষার একটি পবিত্র কর্তব্য। তিনি প্রায়ই বলতেন, "মুসলমানের-জীবনই একটা যুদ্ধক্ষেত্র–এ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের আত্মরক্ষা কিংবা নিজের দেশ বা আদর্শ রক্ষার জন্যে কদাচিৎ তাকে তলোয়ারের সাহায্য নিতে হয়। তাঁর মতে শত্রু যতোই প্রবল হোক না কেন একে জিহাদে আসগর বা ছোট ধর্ম-যুদ্ধই শুধু বলা যায়। কিন্তু প্রতিদিন তাঁকে নিজের পাপ বাসনা-কামনা আর লোভ-লালসার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে "জিহাদে আকবর" বা বড় ধর্মযুদ্ধ।" তিনি বলতেন, "এ যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক থেকো, এ যুদ্ধে কখনো পরাজয় স্বীকার করো না। আর মনে রেখো, এ হচ্ছে জীবনত্যাগী সংগ্রাম। এ-যুদ্ধে যে সফল হবে, সে পাবে শহীদের দরজা–যদিও তার মৃত্যু ঘটে বিছানায় আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায়।" জিহাদে আসগর এবং জিহাদে আকবর সম্পর্কে বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী (ক.)'র এ ধরনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের মর্মমূলে রয়েছে বিশ্বনবী (দ.)'র জীবন, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তৎপরবর্তী সাহাবাকেরামসহ বিভিন্নজনের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের প্রতিফল। তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাসাওউফ সাধনাকে ইসলামী জীবন বিধানের জন্যে অত্যাবশ্যক হিসেবে নির্দেশিত করেছে। কারণ তাসাওউফ সাধনা ব্যতীত লোভ, লালসা, কামনা-বাসনা, হিংসা বিদ্বেষের মতো মানসিক বিমার মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

বিশ্বনবী (দ.) হিজরতের কয়েক বছর পর একান্ত বাসনা নিয়ে পবিত্র কাবা গৃহে তাওয়াফের আশায় মক্কা অভিমুখে রওনা দেন। পবিত্র নগরীর উদ্দেশ্যে তাঁর যাত্রা সঙ্গী প্রায় দেড় সহস্র। কোন রণ প্রস্তুতি এবং রণ সম্ভার সঙ্গে নেই। নিরাপত্তার জন্যে সহযাত্রীদের সঙ্গে রাখা সমস্ত তলোয়ার খাপের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। সাহাবীদের নিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) পৌঁছলেন মক্কার সন্নিকটে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে। অপ্রস্তুত মক্কাবাসীরা তাঁকে প্রবেশে নিষেধ করলেন। তিনি প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিলেন কোন প্রকার যুদ্ধ বা হাঙ্গামার জন্যে নয় বরং বহু বছর পর কাবা গৃহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন। মক্কার প্রতিনিধিরা বাধা দিয়ে বললেন এবার নয়, পরবর্তীতে দেখা যাবে। এ ব্যাপারে চুক্তির প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়। বিশ্বনবী (দ.) চুক্তিবদ্ধ হতে সম্মত হলেন। চুক্তি লেখার দায়িত্ব পড়ে হযরত আলী (ক.)'র উপর। আলী লিখলেন 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম'। কোরাইশ প্রতিনিধির আপত্তি 'রহমানুর রহিম' বলে কোন আল্লাহ্ আছেন তা তারা মানে না । হযরত আলী (ক.) ইতস্তত করতে লাগলেন। হুজুর (দ.) বলে দিলেন, কেটে দাও। অতঃপর আলী লিখলেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (দ.)'র পক্ষে থেকে। কোরাইশ সর্দারের ফের আপত্তি। মুহাম্মদকে আমরা রাসূল মানি না। রাসূল মানলে সকল ঝগড়াইতো মুহুর্তে মিটে যেতো। রাসূল শব্দ কেটে লিখো আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদের পক্ষ থেকে। হযরত আলী তা কাটতে অস্বীকার করলেন। কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে তা কাটা অসম্ভব। কিন্তু এটা না করলে কোরাইশরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবে না। এতে রক্তপাত ও যুদ্ধের শংকা দেখা দিচ্ছে। শান্তির দূত বিশ্বনবী (দ.) আবারো হস্তক্ষেপ করলেন। রাসূল শব্দটা কেটে দিতে বললেন। আলী রাজী হননি। শান্তির আশায় বিশ্বনবী (দ.) নিজের পবিত্র হস্তে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের মহান শব্দ 'রাসূল' কেটে দিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হলো। এখানে হযরত আলীর অবস্থান 'আইনুল ইয়াকীনের'-অর্থাৎ আল্লাহ্র দরবারে বিশ্বনবী (দ.)'র মর্যাদা, সম্মান, প্রভাবের প্রত্যক্ষদর্শীর স্তর।

বিদায় হজ্বের পূর্বে মক্কা বিজয়ের পর বিশ্বনবী (দ.)'র নির্দেশে হযরত হযরত আবু বকর (রা.)'র নেতৃত্বে হজ্বের মওসুমে একটি প্রতিনিধি দল কাবা শরীফ জিয়ারতে গমন করেন। কাবার পথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ইতোমধ্যে সূরা তওবার মুশরিক, কাফির এবং মুনাফিকদের হজ্ব সম্পন্ন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার "আল-বরাত" আয়াত নাজিল হয়। বিশ্বনবী (দ.) আয়াতসমূহ উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্র নির্দেশে আপন গোত্রজন হিসেবে হযরত আলী (ক.) কে দ্রুত প্রেরণ করেন এবং আয়াতসমূহ লোক সমাবেশে পাঠ করে স্বকণ্ঠে শোনানোর

জন্যে আলী কে নির্দেশ দেন। হজ্বে ইমামতি হযরত সিদ্দিকে আকবর সম্পন্ন করলেও আয়াতসমূহ জনসম্মুখে পাঠ করে শোনান হযরত আলী (ক.)। এ ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌র ওহী হুজুর (দ.) সমীপে হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক পেশ করার পর কাবার তীর্থ যাত্রীদের সম্মুখে পেশ করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন হযরত আলী (ক.)। এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত হযরত আলী (ক.)'র বিশেষ মর্যাদা।

অষ্টম হিজরীর ১৮ রমযান হযরত রাসূলে করীম (দ.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে দশ সহস্রাধিক সশস্ত্র সাহাবা নিয়ে কাবার পথে গমন করেন। বিশাল এই বাহিনীর অভিযানে ইসলামের পতাকা প্রথম বহন করেছিলেন হযরত সা'দ বিন ওবাইদা আনসারী (রা.)। অভিযানের অগ্রযাত্রায় তিনি এতো অত্যুৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন যে, পথে প্রায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠতে লাগলেন, "মক্কার জন্যে আজ ভীষণ রক্তপাতের দিন"। এ ধরনের অত্যুৎসাহী চিৎকার বিশ্বনবী (দ.)'র নির্দেশের পরিপন্থি। কারণ, অকারণে রক্তপাত ইসলাম ধর্মে পরিপূর্ণভাবে বারিত। বিশ্বনবী (দ.) সঙ্গে সঙ্গে হযরত সা'দের হাত থেকে ইসলামের পাতাকা কেড়ে নিয়ে হযরত আলী (ক.)'র হাতে অর্পন করেন। শৌর্য-বীর্যের জন্যে ইতোমধ্যে সারা আরবে কিংবদন্তী হয়ে পড়া হযরত আলী (ক.) বিজয় মুহূর্তে ছিলেন সংযমী অথচ প্রচন্ড সাহসী। হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুর আচমকা আক্রমণে প্রায় সকলেই ছত্রভঙ্গ, কিন্তু অনড়-অটল থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনলেন 'আলী'। ইয়েমেনে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (দ.)'র পক্ষে প্রেরিত হন হযরত আলী (ক.)। তখনকার হমদান গোত্রের সকলে হযরত আলী (ক.)'র হৃদয়স্পর্শী মধুময় বক্তৃতা শুনে একদিনেই সবাই ইসলাম ধর্ম কবুল করে নেন। এ সবই হযরত আলী (ক.)'র বিশেষ মাহাত্ম্য।

বিদায় হজ্বের সময় হযরত আলী (ক.) ছিলেন ইয়েমেনে। তিনি ইয়েমেন থেকে সরাসরি মক্কা আগমন করে হজ্বে সামিল হন। আরাফাতের ময়দানে বিশ্বনবী (দ.)'র ঐতিহাসিক ভাষণের পর হজ্ব সমাপনান্তে মদিনা ফেরার পথে গাদীরে খুম নামক স্থানে সকল হাজীকে সমবেত করে হযরত আলী (ক.)'কে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে হযরত আলী (ক.)'র হাত উর্ধে তুলে ধরে অসিয়ত মূলক ভাষণ দেন। এ ভাষণে বিশ্বনবী (দ.) সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন "তোমরা কি জান না যে, আমি মু'মিনদের জন্যে তাদের নিজেদের সত্তার চেয়ে উত্তম? সকলে সমস্বরে বলেন, হ্যাঁ। অতপর বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু, ইয়া আল্লাহ্ যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসে আপনিও তাকে ভালবাসুন। আর যে ব্যক্তি আলীকে শত্রু মনে করে, আপনিও তাকে শত্রু মনে করুন। আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা।" গাদীরে খুমের সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ এ সমাবেশে বিশ্বনবী (দ.)'র ভাষণে আল্লাহ্‌র দরবারে আলীর মর্যাদার বিষয়টি পুনঃব্যক্ত হয়েছে। তাফসীরকারকদের মতে এদিন বেলায়তের তাজ প্রকাশ্যে হযরত আলী (ক.)'র উপর অর্পিত হয়।

বিশ্বনবী (দ.)'র বেসালের পর মদিনার সাকীফায়ে বনু সায়েদায় আনসার-মুহাজিরদের বৈঠকে আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে বিশ্বনবী (দ.)'র হিজরতের সময়কালে সওর গুহার একমাত্র সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। ইতিহাসের তথ্য মতে বিশ্বনবী (দ.)'র বেসালের পর খিলাফতের জন্যে আনসার সর্দার সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) কে আনসারদের পক্ষ থেকে খলিফা নির্বাচিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। খিলাফতের জন্যে উমাইয়ারা হযরত উসমান (রা.) কে অগ্রবর্তী করতে সচেষ্ট হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত আব্বাস (রা.) এ পদের প্রত্যাশী ছিলেন। তবে মুহাজিরদের মধ্য থেকে হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবাইর (রা.), হযরত আব্বাস (রা.) হযরত আলী (ক.)'কে খলিফা পদে মনোনীত করতে সংঘবদ্ধ হন। তাঁদের সঙ্গে কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানও সম্মত হন। অবশ্য হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের পর হযরত আলী (ক.) খলিফা নির্বাচিত হলে কিছুদিনের মধ্যে হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.) উসমান হত্যার প্রতিকারের দাবীতে আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটনের নেতৃত্ব দেন। তবে প্রথম খলিফা নির্বাচন বিষয়ে এ ধরনের উদ্যোগে হযরত আলী (ক.)'র প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা এবং তৎপরতা লক্ষণীয় ছিল না। কারণ এ বিষয়ে বিশ্বনবী (দ.)'র অসিয়ত ছিল যদি আনসার মুহাজির নেতারা তাঁর উপর খিলফতের দায়িত্বভার অর্পন করে তবে যেন তিনি তা কবুল করে পরম সততা এবং একাগ্রতার সঙ্গে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। আর যদি তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পন না করা হয় তবে যিনি খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়। হযরত আলী (ক.) বিশ্বনবী (দ.)'র অসিয়ত যথার্থ অর্থে পালন করেন। হযরত আলী (ক.) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে রাষ্ট্র পরিচালনা কাজে প্রাসঙ্গিক প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা করেন। এ সময়ে তিনি খলিফা হিসেবে

অস্থায়ী দায়িত্বও পালন করেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতের প্রথম ছয় বছর হযরত আলী (ক.) প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম হযরত উসমান (রা.)'র প্রধান পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ লাভ করলে ক্রমান্বয়ে হযরত আলী (ক.)'র সঙ্গে হযরত উসমান (রা.)'র দূরত্ব বেড়ে যায়। এটি অবশ্য খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাসে ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের পর হযরত আলী (ক.) খলিফা নির্বাচিত হন। প্রায় সাড়ে চার বছর খিলাফত পরিচালনা কালে হযরত আলী (ক.) রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী তদারকির পাশাপাশি বলতে গেলে সার্বক্ষণিকভাবে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) হত্যার বিচারের দাবীতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কে সামনে রেখে আশারা মোবাশ্‌শারা হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.) কে পদবান রেখে ষড়যন্ত্রকারীদের একটি অংশ মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গৃহ-যুদ্ধের সূচনা করে। অপ্রয়োজনীয় এ যুদ্ধে হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.) রণক্ষেত্রে চক্রান্তকারীদের বিষধর তালোয়ারের আঘাতে শহীদ হন। অপ্রয়োজনীয় এ যুদ্ধে অনেক সাহাবা প্রাণ হারান। হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতকে উপলক্ষ্য করে হত্যার বিচারের দাবীতে সিরিয়ার শাসক আমীর মোয়াবিয়ার নেতৃত্বে খোলাফায়ে রাশেদীনের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহ সশস্ত্র গৃহ যুদ্ধে রূপ নেয়। এ যুদ্ধের সরাসরি ফলাফল হিসেবে আক্ষরিক অর্থে খোলাফায়ে রাশেদীন তথা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বশীল গণ-অধিকার ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে। হযরত আলী (ক.) কে শাহাদতের পূর্বে উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের মতো ভয়াবহ প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের পর কথিত শিয়া নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা এবং খারেজী বিদ্রোহীদের দমনে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে হয়। দুমাতুল জন্‌দলে প্রতারণা এবং শঠতাপূর্ণ সালিশী রায় ঘোষণার মাধ্যমে আক্ষরিক অর্থে রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থ ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ নৈতিকতার অবসান ঘটতে থাকে। হযরত আলী (ক.)'র শাহাদত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ খলিফা হযরত হাসান (রা.)'র খিলাফত পরিত্যাগের পর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে দ্রুত ধার্মিকতা এবং নৈতিকতা অপসৃত হতে দেখা যায়।

হযরত আলী (ক.) সর্বাবস্থায় যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে অনেকাংশে বিশৃঙ্খল অবস্থায় খিলাফত পরিচালনা করেন। বিভিন্নমুখী চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ও রক্তপাতের মধ্যেও হক এবং বাতিল প্রশ্নে হকের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় এবং সদা সতর্ক। বায়তুল মালের সম্পদ বন্টন এবং নিরীহ গরীব মানুষের অধিকার সংরক্ষণে তাঁর পদক্ষেপ ছিল সব সময় বস্তুনিষ্ঠ।

বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী কখনো কোন ব্যক্তিকে তাঁর শত্রু মনে করতেন না, বরং আদর্শের প্রতিপক্ষ ভাবতেন। তিনি তাঁর প্রতিপক্ষেরও অকল্যাণ কামনা করতেন না। দুমাতুল জন্‌দলের কথিত মীমাংসার পর আমীর মোয়াবিয়া তাঁর অধিকারভুক্ত এলাকার মসজিদের খুত্‌বায় আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (ক.)'র প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য এবং অভিসম্পাত দেয়ার নির্দেশ দিলে একই ধরনের ধিক্কারপূর্ণ খুত্‌বা প্রদানের জন্যে হযরত আলী (ক.)'কে তাঁর অনুসারিরা অনুরোধ জানালে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করে উল্লেখ করেন 'মোয়াবিয়া যা করছে তা কখনো আমার পক্ষে শোভনীয় ও সম্ভব নয়।' হযরত আলী (ক.)'র বিরুদ্ধে আমীর মোয়াবিয়ার যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে সিরিয়া বাহিনী সিফ্‌ফিনের ময়দানে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম নদীর তীর নিজেদের দখলে নেয় এবং নদীর পানির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে হযরত আলী (ক.) সমর্থিত বাহিনীকে পানি ব্যবহারে বাধা প্রদান করতে থাকে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমীরুল মু'মিনীনের বাহিনী সিরিয়া বাহিনীকে নদীর তীর থেকে বিতাড়িত করে, পানির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনীসহ সকলের জন্য পানির ব্যবহার উন্মুক্ত করে দেয়। এখানেই বেলায়তের অনির্বান আলোর সঙ্গে লোক দেখানো ধর্মাচারীদের খোদায়ী প্রাকৃতিক বিধান অনুশীলনে তারতম্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

চরম গোলযোগের মধ্যেও খিলাফত পরিচালনা কালে হযরত আলী (ক.) প্রাদেশিক গভর্ণর এবং বায়তুল মালের হিসাব নিকাশ তদারকিতে ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ, সুশৃঙ্খল, ত্রুটি বিচ্যুতি দমনে অত্যন্ত কঠোর, জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সদা তৎপর। সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এবং তাদের যে কোন অভিযোগ সরাসরি আমলে নেয়ার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং সেবাধর্মী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগের কারণে প্রদেশসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্ণর, সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাধ্যমে তাদের আচার আচরণ সম্পর্কে তিনি সহজে জ্ঞাত হতেন। জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের যে ব্যবস্থা হযরত আলী (ক.) চালু রেখেছিলেন তাঁর শাহাদাতের পর লোকজন আমীর

মোয়াবিয়ার নিকট এ ধরনের অভাব অভিযোগ এবং সদিচ্ছা নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেখানে প্রবেশাধিকার বারিত ছিল। এর পরেও যাঁরা আমীর মোয়াবিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রাপ্ত হতেন তারা গভর্ণর এবং সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসদাচরণ, দুর্নীতি এবং আমীর মোয়াবিয়ার কোন কাজের বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করলে, আমীর মোয়াবিয়া বলতেন, "হযরত আলী (ক.) প্রজাদের সাহস এতোই বাড়িয়ে দিয়েছেন যে, জনসাধারণ তাদের আমীরের সমালোচনা সম্মুখে করতেও দ্বিধা করছে না।"

হযরত আলী (ক.) কখনো খিলাফত ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মরত গভর্ণর, কর্মচারীদের নিজের অন্ধ ভক্ত বানাতেন না, বরং প্রকৃত অর্থে মোত্তাকী হতে আহ্বান জানাতেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর কোন আত্মীয় অথবা ভক্তেরও যদি কোন রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি, অলসতা গড়িমসি দেখা যেত, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের পদচ্যুত এবং তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তাঁর খিলাফতকালে এ ধরনের অসংখ্য নজীর পরিদৃষ্ট হয়েছে। দুর্নীতিবাজ, ডাকাত, ভণ্ড কপটরা তাঁকে যমদূত সম ভয় করতো। আর তিনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ছিলেন অতি সংবেদনশীল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ এবং জনসাধারণের প্রতি জবাবদিহিতার বিষয়টি সর্বাবস্থায় সমীহ করে কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। খিলাফতের প্রশাসনিক নীতিমালা ঘোষণাকালে হযরত আলী (ক.)'র নির্দেশ ছিল, "মুসলমান আর অমুসলমান সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করবে। মুসলমানরা তোমার ভাই আর অমুসলিমরা ঠিক তোমার মতোই মানুষ।" প্রশাসনিক কর্তব্য কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল "পক্ষপাত আর আত্মীয় তোষণ নীতি যেন তোমাকে আল্লাহ্ আর মানুষের প্রতি কর্তব্য লঙ্ঘনে বাধ্য না করে আর যেন নিয়ে না যায় অত্যাচার নির্যাতনের পথে"। কর্মচারি নিয়োগে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশনা দিয়ে অত্যাচারী শাসকদের অধীনে যারা কাজ করেছে এবং যারা রাষ্ট্রীয় অত্যাচার নির্যাতনের সহযোগী ছিল ও তাতে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কোন প্রকার সরকারি দায়িত্বে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা দেন। দুর্নীতি বা তহবিল তসরুপের মতো গর্হিত কাজে যেন কর্মচারীরা প্রলুব্ধ না হয় সেজন্য সন্তোষজনক বেতন-ভাতা প্রদানের নির্দেশনাও তাঁর ছিল। কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ গোপন পর্যবেক্ষণের জন্য খুবই বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ দিয়ে খিলাফত পরিচালনায় সুনীতি সংরক্ষণের জন্যে তিনি তাগিদ দিতেন। সামরিক বেসামরিক বিচার বিভাগ সর্বত্রই সর্বোৎকৃষ্টদের নিয়োগ দেয়ার জন্যে তাঁর নির্দেশনা ছিল। তাঁর মতে রাষ্ট্র গঠন ও ব্যবস্থা আক্ষরিক অর্থে জনগণের সংহতি, সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যে প্রবর্তিত হয়েছে। খিলাফত পরিচালনাকালে হযরত আলী (ক.) মানবাধিকার এবং কল্যাণময়তার সৃষ্টিশীল যে দৃষ্টিভঙ্গী গড়তে সচেষ্ট ছিলেন তাতে লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি চেয়েছিলেন রাষ্ট্র কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনাই হোক মানব সভ্যতার মার্জিত এবং বিকশিত রূপ।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে হযরত আলী (ক.) উল্লেখ করেন "সমস্ত প্রশংসা আর গৌরব আল্লাহ্‌র যাঁর গুণ ও গুরুত্ব কোন যুগের কোন বাগ্মীই বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। যাঁর করুণা আর বদান্যতার হিসাব করতে সর্বযুগের হিসাব আর গণিতজ্ঞরাও ব্যর্থ হবে। শত চেষ্টা করেও তাঁর প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জানানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যতো কঠোর রিয়াজত করা হোক না কেন তাঁর অস্তিত্ব ও সত্তা কারো পক্ষে বুঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যুক্তি বিবেচনা দিয়ে তাঁর নাগাল মিলেনা। বুদ্ধি, বোধশক্তি ও বিদ্যার গভীরতা দিয়েও আল্লাহ্‌র জাতের উপলব্ধি অসম্ভব। মানব-মনীষার বোধ, বোধি-উপলব্ধি আর পাণ্ডিত্য তাঁকে দেখতে ও তাঁর শক্তি ও গৌরবের পরিধি ধারণা করতে অক্ষম। তাঁর সিফাতকে (গুণাবলী) নির্দিষ্ট, সীমিত আর কোন রকম সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না। পৃথিবীর কোন ভাষায় এমন কোন শব্দ নেই যদ্বারা তাঁর সিফাত আর জাত (সত্তা) বর্ণনা করা যায়। তিনি চিরন্তন ও চির-বিদ্যমান, তাই তাঁর সূচনার সময় নির্দেশ এবং তাঁর বিদ্যমানতার সময়সীমা নিরূপণ অসম্ভব।"

বিশ্ব সৃষ্টি বায়ুমণ্ডলের বিশ্বব্যাপী বিস্তার, তরল মাটি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে পাহাড় পর্বতে পরিণতি, যা বিশ্ব-দেহে খুঁটির কাজ করছে এ সবই আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার নিদর্শন। ধর্মের পথে পদক্ষেপ হলো আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে, স্বীয় বুঝে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়া। বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকোন উপাস্য নেই। এটি আন্তরিকতার সঙ্গে একান্তভাবে মেনে নেয়া হচ্ছে ঈমান। তাওহীদে বিশ্বাসের সত্যিকার রূপ হচ্ছে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পাক আর স্বভাব বা প্রকৃতির উর্ধে। তাঁর সঙ্গে যেমন কোন কিছুই যোগ করা যায় না, তেমনি কিছুই বিয়োগ করা যায় না, এমন কি তিনি উপলব্ধিরও উর্ধে।"

হযরত আলী (ক.) স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন যে, "আল্লাহ্‌র জাত আর আল্লাহ্‌র সিফাতে কোন পার্থক্য নেই। আর এ দু'য়ের পার্থক্য করা অন্যায় এবং অনুচিত। তাঁর জাত থেকে

তাঁর সিফাতকে যে পৃথক মনে করে, বুঝতে হবে সে আল্লাহ্‌র একত্ব বিসর্জন দিয়ে, দ্বিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। এ-রকম মানুষই আল্লাহ্‌র খণ্ডিত অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এ রকম বিশ্বাস যে পোষণ করে তার পক্ষে আল্লাহ্‌র সত্যিকার উপলব্ধি সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যক্তি অজ্ঞ। এ ধরনের ব্যক্তি সবসময় নিজের কাল্পনিক বস্তুকেই দেবতা ভাবতে চেষ্টা করে। যে কেউ এমন বিশ্বাস পোষণ করে, সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এ ধরনের ব্যক্তি চায় আল্লাহ্‌কে স্থানে স্থানে বা বিশেষ ক্ষমতায় বা সিফাতে আবদ্ধ করে রাখতে। এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে নিজের সৃষ্ট বস্তুর সমস্তরে নামিয়ে আনে।"

আল্লাহ্‌র সিফাতকে জাত থেকে পৃথক ভাবনাকারীরা মূলতঃ আল্লাহ্‌কে কোন স্থান বিশেষের গুণে গুণান্বিত হিসেবে নির্দেশ করে আল্লাহ্‌র সর্বময় বিরাজমান অবস্থানকে সীমাবদ্ধ করতে চায়। তারা আল্লাহ্‌কে কোন বিশেষ অবস্থা বা ঘটনায় আবদ্ধ করে তাঁকে ছাড়াই কোন বিশেষ কাল বা স্থান থাকতে পারে বলে মনে করে থাকে। এ ধরনের বিশ্বাস ও কর্ম আল্লাহ্‌র সর্বজ্ঞতা এবং সর্বত্র উপস্থিতিকেই অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র সীমাহীন সার্বোভৌম ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণাকেই রদ করে দেয়। আল্লাহ্ সম্পর্কে এ রকম ধারণার ফলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সংখ্যাভিত্তিক ঐক্যে পরিণত হবে। এ ধরনের সংখ্যা ভিত্তিক ধারণা যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগে চলমান আছে। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জাত ও সিফাতকে পার্থক্য করা তাওহীদের পরিপন্থী)।

"আল্লাহ্‌র জন্যে স্থান নির্দেশ করা– অর্থাৎ কোন স্থান বিশেষ বা তার উপর আল্লাহ্ আছেন মনে করা মানে আল্লাহ্‌র স্থানকে সীমাবদ্ধ করে তাঁর সর্বময় সগৌরবে বিদ্যমান অবস্থানকে সীমাবদ্ধ করা। এ ধরনের বিশ্বাস ও ধারণায় আল্লাহ্‌কে খাটো করা হয়। এ ধরনের ধারণায় এটিও থাকে যে আল্লাহ্‌কে ছাড়া অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতির বাইরেও কোন স্থান রয়েছে।"

"তাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন, কোন নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ্‌র আবির্ভাব ঘটেনি। আর তিনি করো দ্বারা সৃষ্ট নন। কোন প্রকার অনস্তিত্ব থেকে তাঁর অস্তিত্ব আসেনি। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে তিনি আছেন, তবে শারিরীক বা দৈহিকভাবে নয়, তিনি সব কিছুর থেকেই দূরে, এ ধরনের তথ্য মানে দৈহিক দূরত্বে নয় বা কোন বিষয়ে তিনি নির্লিপ্ত বা উদাসীন নন। আল্লাহ্ সক্রিয়, স্বয়ংক্রিয়, সর্বাবস্থায় কর্মরত। তবে তাঁর কর্মে এবং ক্রিয়ায় কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না। কোন যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারের প্রয়োজনও তাঁর কর্মসম্পাদনে দরকার হয় না। দেখার মতো সৃষ্ট বস্তু যখন ছিল না, তখনো তিনি দেখতেন। তিনি এক, একক ও নিঃসঙ্গ, কারণ তাঁর কোন সঙ্গী নেই। তাঁকে সঙ্গ দেয়ার বা সঙ্গের অভাববোধ তিনি করেন না।"

"আল্লাহ্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই সময় আর একই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তাতে যা কিছু আছে সবই অতি নিখুঁত আর চমৎকারভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন। কোন রকম দুর্ভাবনা ছাড়াই তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন। পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে তার ফলাফল দেখে, নিজের পরিকল্পনাকে শোধরিয়ে তিনি কিছু করেননি। তাঁর জন্যে এ ধরনের প্রক্রিয়া কোন প্রয়োজন হয়নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে তাঁর অস্তিত্বকে ক্রিয়াশীল করতে হয়নি। আগাম কোন পরিকল্পনা করে, সযতনে তাঁর কার্যকারিতা দেখে নিয়ে তবে বিশেষ কোন কর্মসূচি বাস্তবায়নে হাত দিতে তিনি বাধ্য হননি। অর্থাৎ কোন কিছু গড়তে বা করতে যে ধরনের মানবীয় প্রক্রিয়া অনুশীলন হয় তার কোন কিছুই আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৌশলে প্রয়োজন হয় না।" তাওহীদ, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে বেলায়তের সম্রাট, বিশ্বনবী (দ.)'র জ্ঞান জগতের সিংহ পুরুষ হযরত আলী (ক.)'র উপর্যুক্ত খুত্‌বা তাসাউওফ পন্থীদের জন্যে এক সীমাহীন দিক নির্দেশনা।

ধর্মীয় ফরজ বিধান সম্পর্কিত খুত্‌বায় হযরত আলী (ক.) হজ্ব সম্পর্কে বলেন, "তাঁর পবিত্র গৃহে হজ্ব করা আল্লাহ্ তোমার জন্য অত্যাবশ্যক করেছেন। ঐ গৃহকে তিনি সমস্ত মানব জাতির জন্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি আর উপাসনার জায়গা করেছেন। পশুরা যেমন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলভূমির চারদিকে ভীর জমায় অথবা পায়রা যেমন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নিরাপদ স্থানের দিকে ছুটে যায়, তেমনি মানুষও তার বিশ্বাস আর ধর্ম পিপাসা নিবারণের জন্যে এ গৃহের চারদিকে ক্রমে জমায়েত হয়। আশা আর শান্তির জন্যে মানুষ আল্লাহ্‌র গৃহে এসে সমবেত হয় এবং চায় পাপ, তাপ আর গোনাহ থেকে মুক্তি। সমস্ত প্রশংসা আর গৌরব আল্লাহ্‌র জন্য, তিনি হজ্বের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর ক্ষমতার প্রতি মানব মনের আনুগত্য পরীক্ষার জন্যে এবং তার মাহাত্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তির নিদর্শন হিসেবে। মানুষ যখন কা'বার চারদিকে প্রদক্ষিণ করেন, তখন তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র আরশের চারদিকে উড্ডীয়মান ফিরিশ্‌তার মতোই মনে হয়। এ ঐশ্বরিক বাজারে তাঁরা স্বর্গীয় লাভের জন্যেই দরদস্তুর করে থাকেন। মানুষ সম্মুখীন হন আনন্দ আর সন্তোষের সাথে ক্ষমা আর করুণার প্রতিশ্রুতির প্রত্যাশায়। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এ গৃহকে করেছেন ইসলামের প্রতীক ও নিদর্শন।"

নামায আদায়ে হযরত আলী (ক.)'র একাগ্রতা তুলনাবিহীন। নামাযে দাঁড়ালে তাঁর আত্মনিবিষ্ট হওয়ার বহু ঘটনা তাফসীরকারকরা বর্ণনায় এনেছেন। এ বিষয়ে একটি সুপরিচিত ঘটনা হচ্ছে, একবার যুদ্ধে তাঁর পায়ে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল। যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছিলেন। তিনি এতো ব্যথা বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, কাকেও এটি বের করে নিতে দিলেন না। বের করার জন্যে হাত লাগালেই তিনি যন্ত্রণায় শিউরে উঠতেন। হযরত আলীর (ক.) অবস্থা দেখে রাসুলে করীম (দ.) কয়েকজন সাহাবাকে এক পাশে ডেকে বললেন, আলী নামাযে দাঁড়ালে তোমরা তীর টেনে বের করে নিয়ো। বিশ্বনবী (দ.)'র নির্দেশনা অনুযায়ী তা'ই করা হলো। নামাযের সময় সিজদারত অবস্থায় সাহাবাকেরামের কয়েকজন টেনে তীরটি বের করে নেন। আলী মোটেও টের পাননি। নামায শেষে অন্যদের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেই বিস্মিত হয়ে পড়েন। সত্যিই আলী (ক.) নামাযে দাঁড়ালে বাহ্য-জ্ঞান লোপ পেয়ে যেত। আল্লাহ্‌র আরাধনায় একান্ত নিষ্ঠা আর আত্মসমর্পণে আলীর নজীর সাধনা জগতের ইতিহাসে বিরলই রয়ে গেছে।

হযরত আলী (ক.) সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন নিঃসম্বল অবস্থায়। প্রতিদিন পরিশ্রম করে যা আয় করতেন তা দিয়ে কোন রকমে সবর সালামতে জীবন অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ্‌র পথে মানুষের কল্যাণে সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে তাঁর অভিমত ছিল সুস্পষ্ট "প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুই।" ফলে কখনো যাকাত আদায়ের মতো সম্পদ-সম্বল তাঁর ছিল না। আল্লাহ্‌র প্রেমে এতো মাতোয়ারা ছিলেন যে জায়গা, জমি, গৃহ, সম্পদ সম্বল কিছুর প্রতিই তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ-আকর্ষণ ছিল না। তাঁর জীবনাচারে প্রভাবিত হয়েছেন অসংখ্য খ্যাতিমান আউলিয়া-দরবেশ, তাসাওউফ সাধক। হযরত আলী (ক.)'র জীবনবাদ পর্যবেক্ষণ করে আউলিয়া সর্দার হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহ.) উল্লেখ করেছেন "তাসাওউফ জগতে হযরত আলী (ক.) হচ্ছেন আমাদের ইমাম।"

হযরত আলী (ক.)'র পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাওয়া-পরা ছিল অতি সাধারণ। মোটা রুটি আর মোটা কাপড়েই তিনি কাটিয়েছেন সাধাসিধে জীবন। তাঁর এ ধরনের জীবন ধারণ সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন "রাসূলে কারীম (দ.) কি খেতেন সে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণাই নেই। তিনি কোন সময়েই একটানা তিন দিন পেট ভরে খাননি। ঈদে উৎসবেও আলী'র পরিবারের খাবার হতো অতি সাধারণ। আবদুল্লাহ্ ইবনে জুরার (র?) হযরত আলী (ক.)'র দস্তরখানে খেতে বসে অতি সাধারণ খাবার দেখে প্রশ্ন করলে হযরত আলী (ক.) বলেন, "ইবনে জুরার, তুমি প্রবল পরাক্রম বিলাসী রাজাদের কাহিনী শুনেছ–আমি চাই দরিদ্র আর সাধারণের মতো জীবন যাপন করে রাষ্ট্র কার্য চালাতে।" তাঁর জামা-কাপড়ে দেখা যেত অসংখ্য তালি। শীতের দিনেও পরিধানে থাকতনা উপযোগী মোটা বা গরম কাপড়। হযরত আলী (ক.) দামী-পোশাক পরিধান করাকে মনে করতেন বিলাসিতা, দম্ভ, অহংকার ও গোঁয়ার্তুমি।" তাঁর মতে সাধারণ পোশাক পরিধানের মধ্যেই নম্র ও বিনয়ী থাকা যায়।

পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে হযরত আলী (ক.) বলেন "মৃত্যুর পর কি ঘটবে এ সম্পর্কে যদি মানুষের সত্যিকার ধারণা থাকতো তাহলে মানুষ চিৎকার দিয়ে উঠতো এবং আতঙ্কে কাঁপতে থাকতো। মানুষ সহজেই আল্লাহ্‌র বিধান মেনে নিতো। কিংবা মৃতেরা যা দেখেছে তাতো জীবিতদের চোখের অগোচরে রয়েছে। অচিরেই সকলের জীবন থেকে পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং মৃত্যু এসে মানুষের দরজায় ধাক্কা দেবে"। আল-কোরআন এবং ইসলাম ধর্মে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেন, ইসলামের শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আর মহৎ মানুষদের জীবনে কি এমন যথেষ্ট উপকরণ নেই যা দেখে মানুষ সাবধান হতে পারে? জীবনের শেষ পরিণতি যে মৃত্যু এবং মৃত্যু মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে ঐ পাঠ কি মানুষ শিখেনি?" তিনি উল্লেখ করেন, আল্লাহ্ প্রেরিত রাসুলগণ ব্যতীত মানব জাতির ইতিহাসের চেয়ে মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতর বার্তাবাহক আর কি হতে পারে।"

মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কতার নির্দেশনা দিয়ে হযরত আলী (ক.) উল্লেখ করেন, "আল্লাহ্ মানুষকে প্রাচুর্যের অধিকারী করার জন্যে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা ও যাচাই করেন তার জন্যে আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে প্রশংসার পাত্র। তাঁর কাছে গোপনীয় বলে কিছু নেই–তিনি সর্বজ্ঞ। আমাদের গোপন চিন্তাও তাঁর অজ্ঞাত নয়–এমনকি আমাদের অন্তরের অন্তস্থলেও আমরা যা পেতে লোভ করি, কোন কিছুর প্রতি যদি চোরা চাহনি দেই, তা'ও তাঁর জানা।" অতপর হযরত আলী (ক.) ঘোষণা করেন "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ (দ.) তাঁর প্রিয় নবী, যাকে তিনি তাঁর বাণী প্রচারের ভার দিয়েছেন। আমার দিল ও জবানে একান্ত আন্তরিকতায় এবং পরম মমতায় আমি তা বিশ্বাস করি।" এর পর হযরত আলী

বলে উঠেন– আল্লাহ্‌র কসম, যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছি, তা যে অলীক মায়া নয়, এটি এমন এক ব্যাপার যা নিঃসন্দেহে ও অবধারিত ভাবে বাস্তব, এ কোন গাল-গল্প নয়, খাঁটি বাস্তব সত্য, এ এক অনিবার্য সুনিশ্চিত ব্যাপার, মৃত্যু ছাড়া এ আর কিছুই নয়। যে মৃত্যু ঘন্টাধ্বনি করছে-দর্শন দিতে সে কিছু মাত্র গড়িমসি করবে না।" মৃত্যু সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে হযরত আলী (ক.) বলেন, "তোমাদের চারপাশে হাজার হাজার জীবিত লোককে দেখে প্রতারিত হয়ো না। তারাও যেতে বাধ্য-যাবে একের পর এক। এ সেদিনও যারা জীবিত ছিল, এমন মানুষের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই তোমাদের আছে-তারা যথেষ্ট সঞ্চয় করেছিল, ভয় করতো দারিদ্র্যকে। মনে করতো, জীবনের পরিণতি থেকে সে অন্তত মুক্ত। মনে পোষণ করতো এক সহজাত উচ্চাশা-নিজেকে মনে করতো মৃত্যুর হাত থেকে নিরাপদ। তেমন লোকেরও মৃত্যু ঘটতে তোমরা দেখেছ-দেখেছ মৃত্যু তাকে কিভাবে নিজের ঘর-সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আর কিভাবে অপরে কাঁধে করে তাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে কবরে।" মানুষকে সতর্ক করে তিনি উল্লেখ করেন, যাদের মনে অপরিমিত আশা ছিল-যারা বাস করার জন্যে বড় বড় ইমারত তৈরী করেছিল, জড় করেছিল অনেক ধন-সম্পদ, তাদের এ সব ঘর বাড়ি কি কবরে পরিণত হয়নি? তাদের মজুদ করা ধন সম্পত্তি হয়তো ধ্বংস হয়েছে অথবা অন্যেরা তার মালিক হয়েছে। যে কোন অবস্থায় তাদেরকে এসব ছেড়ে যেতেই হয়েছে। তাদের বিধবারা অন্যের সঙ্গে বিয়েতে বসেছে। মৃত্যুর পরে তারা না পারছে নিজের ক্রিয়াকর্মকে বাড়াতে, না পারছে নিজের পাপ-জীবনের কোন অজুহাত দিতে। কিন্তু যে সৎ ও পূণ্য কর্মে জীবনব্রতী হয়েছে, তাকে যে আয়ু দেয়া হয়েছে তার যথার্থ ব্যবহার করেছে, তার জন্যে পুরষ্কার নির্ধারিত, সেইই পুরষ্কারের হকদার। পৃথিবীতে কেউই অমর নয়, এখানকার জীবন-কাল এক সেতু পথের চেয়ে বেশি নয়। অতএব সৎকাজের মাধ্যমে জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করো। নিজের কর্তব্য করে যাও-আর প্রস্তুত থেকো দ্রুত বিদায়ের জন্য। কাজ! কাজ! কাজ! যতোক্ষণ জীবন ও স্বাস্থ্য এবং সুযোগ আছে ততোক্ষণ সৎ কাজ, কল্যাণমূলক কাজ করে যাও, নিজের বাসনা কামনাকে সংযত রাখে বিবেক, মন এবং আত্মাকে কু-চিন্তা আর পাপ বাসনা থেকে মুক্ত রাখো। পৃথিবীকে দুষ্ট প্রতিভার প্রভাব থেকে মুক্ত করে নির্মূল করতে সচেষ্ট থাকো। পৃথিবীতে যে নিজেকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে রুখে রাখতে পারে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ নিষেধের আনুগত্যে বাধ্য রাখতে পারে, সে মানুষই বীর পুরুষ।" যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তার আর কাকেও ভয় করতে হয় না। মনে রাখতে হবে হাজার উপকার সাধনের চেয়েও একটি মাত্র অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশি। মনে রাখতে হবে বিপদ-আপদ আর দুঃখ দুর্দিনে যে রকম আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র শরনাপন্ন হয়, আশা-প্রত্যাশার সু-সময়েও তেমনি আন্তরিকতা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসর্পন করা বাঞ্ছিত।"

হযরত আলী (ক.), মহাত্মা আলী, খায়বর বিজয়ী বীর শ্রেষ্ঠ আলী। তাওহীদ প্রচারে অসীম সাহসী আলী। তিনি ছিলেন যোদ্ধা, কবি, মর্মস্পর্শী বাগ্মী সত্যের পথে অবিচল-অটল, আলী ছিলেন সবসময় শান্তিকামী, কপটতা, ভন্ডামি মুক্ত এক অনন্য উদার চরিত্র। তাঁর সমগ্র জীবন এবং কর্মধারা সুগভীর দার্শনিকতায় প্রোজ্জ্বল। তাঁর জীবন কর্মের সামগ্রিকতায় প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে এক পবিত্র দর্শন-যার নাম বেলায়ত। (চলবে)

সুফি উদ্ধৃতি

- "ইলহাম অর্থ আল্লাহ্‌তা'য়ালার পক্ষ থেকে গায়েবী নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়া। আল্লাহ্‌তা'য়ালার প্রিয়তম বান্দাগণের গুণাবলীর মধ্যে এটি একটি অন্যতম গুণ। 'ইলহাম' কিছু নয় বলে প্রমাণ করতে যাওয়া বে-দ্বীনির আলামত"।
- পাঁচ ব্যক্তির সংসর্গ হতে সর্বদা দূরে থেকো– (ক) মিথ্যুক। তাকে সঙ্গী হিসেবে রাখলে সর্বদাই তুমি তার দ্বারা প্রতারিত হবে। (খ) আহ্‌ম্মক। তার সঙ্গে থাকলে সে তোমার হিত সাধন করতে চাইবে, কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কেননা, সে যা তোমার জন্য করবে, বুঝতে পারবে না যে, এতে তোমার ক্ষতি হবে, না উপকার হবে। (গ) কৃপণ। কেননা, সর্বদা সে নিজের লাভের জন্য তোমার ক্ষতিই করতে থাকবে। তোমার সুসময়ে তোমাকে শোষণ করবে আর দুঃসময়ে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করবে। (ঘ) কাপুরুষ। তার সাহায্যের মুখাপেক্ষি হওয়ার সময় তোমাকে সে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে ভয়ে পলায়ন করবে। (ঙ) ফাসেক। কেননা, সে একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়ে তোমাকে বিক্রয় করে ফেলবে; বরং লোভে পড়ে তার চাইতে ন্যূনতম স্বার্থের বিনিময়েও তোমার মাথায় বিপদ চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

– হযরত ইমাম সৈয়দ জাফর সাদেক (রা.)

গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র পদসোপান সম্পর্কে "বাহ্জাতুল আসরার" গ্রন্থে'র উদ্ধৃতি

আলোকধারা প্রতিবেদন

['বাহ্জাতুল আস্রার' হচ্ছে বড়পীর গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র পবিত্র জীবনী সম্পর্কিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের লেখক হলেন হযরত ইমাম আবুল হাসান আলী সাত্বনুফী শাফেয়ী (রহ.)। এ গ্রন্থে বড়পীর হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর সমমর্যাদায় অভিষিক্ত সমকক্ষ একজন বন্ধু (মাওয়ানেস) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে। গাউসুল আযম বড়পীর হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র যমানার পর গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ব্যতীত সুউচ্চ বেলায়তপ্রাপ্ত অন্যকোন আউলিয়ার মধ্যে কাশফ-কারামাত, জাহেরি-বাতেনি বিষয়ে ধারণা প্রদান এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানকারী অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন আউলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়নি। গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) খাতামুল অলদ। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহান আল্লাহ্র অনধিক দুই গাউসুল আযমের শেষ সত্ত্বা এবং প্রথম গাউসুল আযমেরই সমকক্ষ স্বাধীন গাউসুল আযম। বাহ্জাতুল আস্রার গ্রন্থে প্রকাশিত উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ বাংলা অনুবাদ সুহৃদ পাঠকের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো] –সম্পাদক।

قوله: قلبي في مكنون علم الله عز وجل في زاوية عن الخلق، ملك على باب الحق سبحانه، أظهره قبلة لكل وارد من أهل زماني، وأصل من وراء الإغلاق على بساط الأنس والقرب جالس، والملك الفرد له مؤانس مطلع على أسرار الخليقة ناظر إلى وجوه القلوب قد صفاه الحق عن دنس رؤية سواه حتى صار لوحًا ينقل إليه ما في اللوح المحفوظ، وسلم إليه أزمة أمور أهل زمانه وصرفه في عطائهم ومنعهم، وقال له بلسان الغيب إنك اليوم لدينا مكين أمين، وأقعده مع أرواح أهل اليقين على دكة بين الدنيا والآخرة، بين الخلق والخالق بين الظاهر والباطن، بين ما يدرك وبين ما لا يدرك، وجعل له أربعة وجوه: وجه ينظر به إلى الدنيا، ووجه ينظر به إلى الآخرة، ووجه ينظر به إلى الخلق، ووجه ينظر به إلى الخالق، وصيره خليفة في أرضه وعوالمه، فإذا أراد به أمرًا قلبه من صورة إلى صورة، ومن هيئة إلى هيئة فأطلعه على خزائن الأسرار لأنه مفرد الملك ونائب أنبيائه، وأمين مملكته في وقته، وله في كل يوم وليلة ثلاثمائة وستون نظرة إليه.

(বাহ্জাতুল আস্রার, পৃষ্ঠা–৬৪, আল্-তাওফিকীয়া বুকশপ, কায়রো, মিশর)

বঙ্গানুবাদ

"আমার অন্তরাত্মা মহান জ্যোতির্ময় আল্লাহ্‌র অনন্ত জ্ঞানদীপের অতি সন্নিকটে এক গোপন নিভৃত স্থানে সংরক্ষিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ রাহমানুর রাহিমের রহমতের দরওয়াজায় রয়েছেন অনুপম সৌন্দর্য ফিরিশতা ব্যক্তিত্ব (স্বরূপ)। আমার যমানায় আসা প্রত্যেকের জন্য সেটিকে কিবলা করা হয়েছে। তিনি প্রেম ও নৈকট্যের মূলবস্তু তথা তালার চাবি হয়ে বসে আছেন। **আর এমন অন্যতম একক বাদশাহ, যাঁর পরস্পর সমানুরূপ এমন একজন বন্ধু বা সাথী (মাওয়ানেস) রয়েছেন, যিনি সৃষ্টির গোপনীয়তার রহস্যজ্ঞান এবং রুহ্‌সমূহের সামগ্রিক অবস্থা অবলোকনকারী। মহান আল্লাহ্ তাঁকে আল্লাহ্'র অনুপম পবিত্র সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কিছুর দর্শন থেকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন।** তিনি এমন আলোকময় ফলকে পরিণত হয়েছেন, যাঁর নিকট "লাওহে মাহফুজ"র তথ্য আসে। সমকালীন সকলের যাবতীয় কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ তাঁর উপর অর্পিত হয়। এ ধরনের অর্পিত ক্ষমতার আলোকে তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন এবং কাকেও বঞ্চিত করার ব্যাপারেও তিনি স্বাধিকার প্রাপ্ত। গায়েবী আওয়াজে তাঁকে জ্ঞাত করা হয়, "আজ তুমি আমার নিকট মর্যাদার আসনে সমাসীন এবং একান্ত নির্ভার বিশ্বস্ত।" দুনিয়া-আখিরাত, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জাহির ও বাতিন, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের মধ্যবর্তী কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর অবস্থান, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাসীরা বসা আছেন। তাঁর রয়েছে চারটি আকৃতি। এসবের একটি দিয়ে দুনিয়া, আরেকটি দিয়ে আখিরাত, একটি দিয়ে সৃষ্টি জগৎ এবং অন্যটি দিয়ে দেখেন মহান স্রষ্টাকে। তিনি পৃথিবী এবং অন্যান্য জগতের প্রতিনিধি তথা খলিফা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত। যখন তিনি কোন বিষয় সম্পর্কে ইচ্ছাপোষণ করেন তখন তাঁর ইচ্ছাশক্তির অনুকূলে আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, রূপান্তর ঘটে গঠন প্রকৃতিতেও। অতঃপর তাঁকে গুপ্ত রহস্যরাজীর সকল অশেষ ভাণ্ডার সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। কেননা তিনি খোদ আল্লাহ্‌তা'য়ালার অনন্য প্রতিনিধি এবং নবী-রাসূলগণেরও প্রতিনিধি। সমকালে তিনি তাঁর কর্মের সালতানাতের জিম্মাদার। তিনি অহর্নিশ ৩৬০ বার আল্লাহ্‌র জ্যোতি বিচ্ছুরণে দীপ্তমান।

সুফি উদ্ধৃতি

- সংসারত্যাগী হওয়া এবং নেক কাজের মনোনিবেশ করা আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের বায়ু স্বরূপ, যা তোমাদের প্রতি প্রবাহিত হচ্ছে।
- মুসলমান ভাইকে অপমান ও অপদস্থ করলে তোমার যত ক্ষতি হবে, রাশি রাশি পাপ তোমার তত ক্ষতি করবে না।
- দুনিয়া দুনিয়াদারদের জন্য ধোঁকার উপর ধোঁকা, আর আখিরাত আখিরাতওয়ালাদের জন্য আনন্দের উপর আনন্দ। আর আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাত মা'রিফাতওয়ালাদের জন্য নূরের উপরে নূর।
- প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসকে আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিয়োজিত রাখাই মা'রিফাতওয়ালাদের ইবাদত।
- আরিফ লোক যখন নীরবতা অবলম্বন করেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথাবার্তা বলার বাসনা তাঁর অন্তরে উদিত হয়। আর যখন চোখ বন্ধ করেন, তখন তাঁর কাম্য এই হয় যে, তিনি চোখ খোলামাত্র যেন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁর সেই বিরাট আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ রয়েছে, এর কারণে তাঁর ইচ্ছা হয়, হযরত ইস্‌রাফীল (আ.)-এর সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া পর্যন্ত যেন তাঁকে আর মাথা উঠাতে না হয়।
- কারও হৃদয়ে আল্লাহ্‌পাকের ইশ্‌কের আবির্ভাব হলে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর যা কিছু রয়েছে সবকিছুকে মধ্যস্থ হতে দূর করে দেয়। অন্য কিছুর নামমাত্রও হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না। শেষ পর্যন্ত সে ব্যক্তি একাকী থেকে যায়– যেমন আল্লাহ্ তা'আলা একক।
- "এমন ব্যক্তি হতে ইল্‌ম শিক্ষা করা উচিত, যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছেছে। যে ব্যক্তি গর্ব করার জন্য ইল্‌ম শিখেছেন এবং ইল্‌ম শিক্ষা দ্বারা যে ব্যক্তি মর্যাদা ও জাঁকজমক কামনা করে, আর আশা করে যে, লোকের নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে, এমন ব্যক্তি হতে দূরে থেকো। কেননা, সে ব্যক্তি প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'আলা হতে দূরে সরে যাচ্ছে, এমন কি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
- প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার মর্যাদায় এমন কি আছে যে, তা পরিত্যাগ করা বড় কঠিন কাজ মনে করা হবে?
- আল্লাহ্ তা'আলার সত্যিকারের পরিচয় পেলে আল্লাহ্ তা'আলার মুহব্বতে মত্ত না হয়ে পারে না। মুহব্বত ভিন্ন মা'রিফাতের কোন মূল্য হয় না।

– হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)

প্রসঙ্গ : তাসাওউফের অলংকার নীরবতা এবং গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম

মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম

যুগে যুগে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের যে সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন তারা সকলেই কঠোর রিয়াজতের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে নিজের সম্পর্ককে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্থানে নিয়ে গেছেন। ঐ সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ রিয়াজতের ধরন হিসেবে বেছে নিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যময় কণ্টকাকীর্ণ পথ। এই সুকঠিন উচ্ছ্বাস উদ্দীপনামুখর পথ পাড়ি দিয়ে প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে জগতে তাঁরা খোদায়ী আশীষবাণী হিসেবে নানারকম মহিমান্বিত খেতাবের অধিকারী হয়েছেন। গাউসুল আযম বিল বিরাসাত কুতুবুল আকতাব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী (ক.) তেমনি একজন মহান সত্ত্বা – যাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি প্রভুর অত্যধিক প্রীতি অর্জনের লক্ষ্যে শ্বাপদ-সংকুল অতিদূর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দেয়ার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছেছেন এবং জগতে ভূষিত হয়েছেন নানান মহিমান্বিত অভিধায়।

বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র আধ্যাত্মিক সাধনা জগতের ক্ষেত্রটি অত্যন্ত বিশাল। আর এই বিশাল সাধনা জগতের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হল আপন প্রেমাস্পদ (মুর্শিদ)'র প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাবা ভাণ্ডারী (ক.) শৈশব থেকেই হযরত আকদাসের অত্যধিক সান্নিধ্য কামনা করতেন। সুযোগ পেলেই তিনি দৌড়ে হযরত আকদাসের হুজরা শরীফে চলে আসতেন। যৌবন বয়সে প্রায়শঃ হযরত আকদাসের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। তার দু'নয়ন থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ত, কিন্তু মুখে কোন শব্দ করতেন না। বাবা ভাণ্ডারী কেবলার এ ধরনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের আলোকে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (ক.)'র ভাষায় বলা যায়– "যে মুরিদ চিৎকার এবং হা-হুতাশ করে সে একটি ক্ষুদ্র কুয়ার ন্যায়। আর যে মুরিদ মৌনাবলম্বন করে থাকে সে মনি-মুক্তাপূর্ণ গভীর সমুদ্রের ন্যায়"। আর খাজা গরীবে নেওয়াজ (ক.)'র ভাষায়– "মিস্কিন মঈন হয়েছে বাকহীন, তোমার প্রশংসা করতে গিয়ে এটাই উত্তম। আমি বাকহীন থেকেই তোমার প্রশংসা করব।" বাবা ভাণ্ডারী'র প্রকৃতি ছিল উপর্যুক্ত ধারায় প্রবহমান ব্যতিক্রম।

আবার মাঝে-মধ্যে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় হযরত আকদাসের চরণ যুগল এমনভাবে জড়িয়ে ধরতেন, উপস্থিত ভক্তবৃন্দের আপ্রাণ চেষ্টার মাধ্যমে বাবা ভাণ্ডারীর বাহু হতে হযরত আকদাসের চরণযুগল মুক্ত করতে হতো। এমতাবস্থায় বাবা ভাণ্ডারী কে ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখতে হতো। তখন বাবা ভাণ্ডারী চিৎকার করে বলতেন "ছেড়ে দাও, দেখতে দাও, প্রাণ যায়"। এ প্রসঙ্গে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী (ক.)'র একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন– "বন্যার গর্জন সমুদ্র থেকে পৃথক হওয়ার কারণে। যখন বন্যা সমুদ্রে মিশে তখন নিস্তব্ধ হয়ে যায়।" অর্থাৎ মহাসমুদ্রের কোন গর্জন হয় না। নীরব-নিঃশব্দতাই মহাসমুদ্রের স্বভাব।

"আশেক-মাশুকের প্রেমের এমনি নিশানা,
তার মরণ বাঁচন সমান কথা, দিল দিওয়ানা।।"

"বিচ্ছেদ মিলন তান, দোযখ বেহেশ্ত জান।
মুর্শিদ গুপ্তের কর্তা জানিও সন্ধানে।।"

বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র সাধনা জগতের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় ভ্রমণের মাধ্যমে। তিনি হযরত সাহেবানির নির্দেশক্রমে দূর্গম পাহাড়-পর্বত এবং গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করার মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ একান্ত নিভৃতে কঠোর রিয়াজতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম, দেয়াংয়ের পাহাড়, উত্তর পাহাড়, সীতাকুণ্ড পাহাড় ভ্রমণের বর্ণনা বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র জীবনী শরীফে পরিলক্ষিত হয়।

বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র সাধনা জগতের অন্যতম একটি মৌলিক দিক হলো "হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক প্রবর্তিত উসুলে সাব'আর পরিপূর্ণ অনুশীলন। উসুলে সাব'আর সকল নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হলেন বাবা ভাণ্ডারী (ক.)। তাঁর জীবনী শরীফে দেখা যায়, তিনি অতি প্রয়োজন ব্যতিরেকে কথা বলতেন না। এমনকি সাধন মার্গের অতি উচ্চস্তরে পৌঁছে তিনি এক পর্যায়ে মানুষের সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছেন। অল্প কথা, অল্প আহার, অল্প নিদ্রা সুফিয়ায়ে কেরামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের সাধন সমৃদ্ধ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী (ক.) বলেন– "নীরবতা ধ্যানের উদ্যান। নীরবতা মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক। নীরবতা মানুষকে দেয় শোভনতার সাথে মর্যাদা, আর রেহাই দেয় ওজরখাহী করা থেকে"।

বাবা ভাণ্ডারী সর্বক্ষণ বিভোর চিত্তে প্রভুর ধ্যানেই মগ্ন থেকে দীদারে ইলাহীর প্রতিক্ষায় সময় অতিবাহিত করতেন। কোন ধরনের দুনিয়াবি মোহ-মায়া-আসক্তি, সামাজিক কিংবা

সাংসারিক জীবনের কর্মসূচি তাঁর সাধনা জীবনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। দুনিয়াতে তাঁর জীবনপ্রবাহ পদ্ধতি ছিল সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের অনুরূপ। যেরূপ সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ চলাচল করলেও জাহাজে পানি প্রবেশ করে না অনুরুপ বাবা ভাণ্ডারী দুনিয়াবী জীবন যাপন করলেও দুনিয়ার কোন মোহ-মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। পিতা-মাতা, ভাই-বোনেরা বিভিন্নভাবে সংসারকর্মে যুক্ত করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা যাঁর প্রতিটি ক্ষণ দীদারে ইলাহীর প্রতিক্ষায় অতিবাহিত হয় তাঁর জন্য সংসারকর্মে সময় অতিবাহিত করার ফুরসতই বা কোথায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (ক.) কে প্রশ্ন করেন– হুজুর! দীদারে ইলাহীর অবস্থা কি? তিনি জবাবে বলেন– "মানুষকে জলমগ্ন হতে দেখেছ কি? কেউ সাগরের জলে ডুবে মারা গেলে জগতে আর সে কখনো ফিরে আসে না। কারও দীদারে ইলাহী নসিব হলে চিরদিন সে তাতে ডুবে থাকে"।

তাঁর বাহ্যিক অবস্থা ছিল– কখনো মৌনতার মাঝে একান্ত শান্ত-শিষ্টতা আবার কখনো মৌনতার মাঝে চির উত্তাল জোয়ার। সাহেবে কাশ্‌ফ সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত এ ধরনের হঠাৎ চিত্র পরিবর্তনের নেপথ্য কারণ জানা ছিল একান্তই অসম্ভব। এভাবেই বাবা ভাণ্ডারীর সাধনা জীবন বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। বাবা ভাণ্ডারী কেবলার স্নিগ্ধ নীরবতা সম্পর্কে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (ক.)'র উচ্চারণে বলা যায়, "হে মঈন, সে তোমার মাঝেই ডুবে আছে। তবু তার নাম কেন জিজ্ঞেস করো? তার নীরবতা ছাড়া এখন আর কোনো জবাব নেই"।

সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজের বাণী

১. ত্বরিকতের প্রথম পথ শরিয়ত। ত্বরিকত পন্থী প্রথমে শরিয়তের পথে চলিতে থাকে এবং তার সমস্ত আহকাম পূর্ণরূপে পালন করে। তৎপর সে ত্বরিকতের পথ পেতে আরম্ভ করে। এই পথেও যখন সে তার সমস্ত শর্তাবলি শরিয়তের সকল আহকামের পায়রবি করে পালন করতে থাকে, তখন সে মারিফাতের রাস্তা প্রাপ্ত হয়। এই পথেও যখন সে দৃঢ়তার সঙ্গে চলতে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার আনুগত্য ও ফরমাবরদারীতে কোন প্রকার শৈথিল্য না করে তখন সে হাকিকতের রাস্তা প্রাপ্ত হয়।

২. আরিফদের এমন একটি স্তর আছে যেখানে পৌছে তাঁরা সমগ্র দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুকে নিজের দুই আঙ্গুলের মাঝখানে দেখতে পান। আরিফ তিনিই, যিনি যা কিছু কামনা করেন, নিজের সম্মুখে উপস্থিত দেখেন, আর যে কথাই মুখে উচ্চারণ করেন এর জবাব গায়েব হতে তৎক্ষণাৎ শুনতে পান। মুহব্বতের ক্ষেত্রে আরিফ লোকের নিম্নতম অবস্থা এই যে, তাঁর মধ্যে আল্লাহ্ পাকের গুণাবলি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে।

৩. চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার মাশায়েখগণ ত্বরিকতের ধাপ পনেরটি বলেছেন। তন্মধ্যে পঞ্চম ধাপ কাশ্‌ফ এবং কারামতের। এই ধাপে উন্নীত হলে খুব সাবধানতা এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় এর পরবর্তী ধাপে উন্নীত হওয়া সুকঠিন। এ স্তরে এসে দুনিয়া এবং তন্মধ্যস্থিত সবকিছু এমনকি নিজের সত্ত্বাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্যথায় ত্বরিকতের শেষ মন্‌জিল পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। এ সমস্ত বিষয় আয়ত্ব না করে ত্বরিকত প্রাপ্তির দাবী করা মিথ্যা।

৪. আশেকের অন্তঃকরণ মহব্বতের অগ্নিকুণ্ড। আল্লাহ্ ভিন্ন যা কিছুই সেই অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তা পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে ফেলে। কেননা আশেকের এশকের আগুনের চেয়ে অধিকতর প্রখর তেজ অন্য কোন আগুনেরই নাই।

৫. হযরত খাজা উল্লেখ করেছেন, "মানসুর (রহ.) কে প্রশ্ন করা হল; দোস্তের ইশ্‌কের মধ্যে কামালিয়াত কাকে বলে? মানসুর বলেন– ইশ্‌কের কামালিয়ত এই যে, মাশুক যদি পরীক্ষা করার জন্যে আশেকের মাথা কাটতে চায়, তবে এতে আশেক কোন আপত্তি করবে না। মাশুকের সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাঁর সন্দর্শনে এমন মগ্ন থাকবে যে, কোন কিছুর প্রতিই খেয়াল থাকবে না।

৬. মানুষ আল্লাহ্ তা'য়ালার পরিচয় লাভ করার লক্ষণ এই যে, সে নীরবতা অবলম্বন করবে এবং লোকালয় হতে দূরে সরে থাকবে।

প্রসঙ্গ : মুসলিম উম্মাহ্‌র আদর্শিক উত্থানের স্বার্থে গবেষণা কর্মের অনিবার্যতা

আলোকধারা ডেস্ক

ইসলামের আইন বিজ্ঞানকে বলে ফিকাহ্। গবেষণা হচ্ছে ফিকাহ্'র মাসয়ালা। ফিকাহ্‌র অন্তর্গত একটি অনুশীলনী প্রক্রিয়া হচ্ছে গবেষণা। ফিকাহ্ বা আইনের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে স্বাধীন মতামত গঠন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় গবেষণা। আধুনিক কোন কোন লেখক গবেষণা বলতে আইনের পুনর্ব্যাখ্যা বা পুনর্বিশ্লেষণ বুঝেছেন। সমাজ এবং সময়ের গতিপ্রবাহের কারণে গবেষণার সংজ্ঞার অনেক ব্যাপ্তি ঘটেছে। মানবিক সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম উম্মাহর অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে, ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রয়াসে, ইসলামের মূলগত ভাবের উপর ভিত্তি করে আইনের সম্প্রসারণ করা এবং প্রাসঙ্গিক নতুন নতুন জিনিস গ্রহণ করার নাম গবেষণা। ইসলাম বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্ নির্দেশিত এবং মনোনীত একমাত্র ধর্ম। এই ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু তথা বিশ্বাস স্থল হচ্ছে তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একক একত্ববাদ। ইসলাম আমাদের পার্থিব জীবনবাদের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত একমাত্র আদর্শ। এই আদর্শ অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা পরিবর্তনশীল মানব সমাজের জন্যে কখনো বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তিসঙ্গত নয়। অতীত ঐতিহ্য নিঃসন্দেহে উপমা হিসেবে উল্লেখের দাবী রাখে। সমাজের নিত্য পরিবর্তনশীল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত এবং সংক্ষেপিত শব্দের নাম 'প্রগতি'। অর্থাৎ প্রগতি হচ্ছে অনুসন্ধানী মানুষের অগ্রবর্তী হবার অদম্য প্রয়াস। এ ধরনের নতুন প্রয়াসের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা সম্বলিত নৈতিক মানদণ্ড নির্ভর সিদ্ধান্ত তথা নীতিমালা নির্ধারণের কর্ম পন্থার নাম গবেষণা। প্রকাশ এবং প্রচারের প্রাথমিক সময় থেকে ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভিন্ন দেশে ভিন্ পরিমন্ডলে স্বীয় মৌলিক আদর্শের আওতায় নিজস্ব রূপ ধারণ করে ব্যক্ত এবং সক্রিয় হয়েছে। পৃথিবীর এক একটি দেশের সংস্কৃতির মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যহ্যিক রূপ এবং দেশজ ধাত ফুটে ওঠে, তেমনি আদর্শিক মৌলিকত্ব এবং শুদ্ধতার স্বাক্ষরও বিদ্যমান রাখা হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারে অনেক সাহাবা, অলি-দরবেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপর্যুক্ত নিয়ম অনুশীলন করে উম্মাহর সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা পৃথিবীর যেখানেই গেছেন সেখানে ইসলামের আদর্শিক সংস্কৃতি ধারণে রেখে জীবনদর্শন হিসেবে তাওহীদবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ধরনের কাজে তাঁদের অনবদ্য সাফল্যের মূলে রয়েছে স্থানিকতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারঙ্গমতা।

ইসলাম নৈতিক মানদন্ডের মৌলিক ভাবের নেতৃত্বে এগিয়ে চলা ধর্ম। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে অলসতা এবং কল্পনা বিলাস মূল্যহীন। ইসলাম কঠোর পরিশ্রম করার জন্যে এবং অবিরাম পরিবর্তনশীল পরিবেশের সামনে জীবনকে তুলে ধরার জন্যে উদ্দীপনা এবং নৈতিক মানদন্ড উভয়ই দিয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম পালনে ও প্রচারে আনন্দ-উদ্দীপনার মাধ্যমে নৈতিক মানদন্ড সংরক্ষণকে সব সময় উৎসাহিত করেছে। তাই ইসলামের আইনকে বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন করতে হয় সমাজ এবং সমসাময়িক মন-মানসের চাহিদার আলোকে সর্বোচ্চ নৈতিক মানদন্ড অক্ষুন্ন রেখে। ফিকাহ্ অনুশীলনের এ ধারার নাম হচ্ছে গবেষণা। একটি বিষয় খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয় যে, অবিরাম পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেকে উপস্থাপন করার সক্ষমতা ও কর্মনিষ্ঠা এবং নৈতিক আদর্শের যে কোন একটি পরিত্যক্ত হলে সে আদর্শ এবং জনগোষ্ঠী পার্থিব জীবন সংগ্রামে পিছিয়ে পড়েছে। একথা অত্যন্ত বাস্তবসত্য যে, ইসলামের পথে অর্থাৎ গবেষণা ও নীতির মিলন পথেই রয়েছে প্রকৃত প্রগতি। কারণ নীতি তথা আদর্শের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ আর কাজ করবার ভার মানুষের। মানুষের কাজের পরিমাপক যন্ত্র হচ্ছে নীতি বা আদর্শ। ইসলামে নীতিবোধ শক্তিশালী হয়েছে সুকঠিন দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে। ইসলাম প্রকৃত অর্থে নীতিবোধ এবং দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ফাঁক রাখেনি। ইসলামের গবেষণা নীতিবাদ এবং দায়িত্ববোধ মানুষের ব্যষ্টিক-সামষ্টিক এবং সর্বকালীন শান্তির জন্যেই গড়া হয়েছে। এটি গড়ে তোলা হয়েছে মানব স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে। তাই ইসলাম মানব স্বাধীনতার বস্তুনিষ্ঠ ধারণা উপস্থাপন করেছে এবং ঘোষণা দিয়েছে যা ইচ্ছা তা করতে পারাটা স্বাধীনতা নয়– বরং তা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নৈরাজ্য। ইসলামে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে কোরআনের নির্দেশনার আলোকে, ব্যাপকভিত্তিক গবেষণার ভিত্তিতে। মানব স্বাধীনতা সম্পর্কিত ইসলাম নির্দেশিত সংজ্ঞা ভাষার তারতম্যের ভিত্তিতে সমাজ বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম এমন এক জীবনবাদী সমাজাদর্শ যা কোন অবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক তো নয়ই এমন কি জাতি ও সম্প্রদায় কেন্দ্রিকও নয়। এ কারণে প্রকৃত মুসলিমের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছে এভাবে, যেখানে এই সম্প্রদায়টি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার তাগিদে সম্প্রদায়গত স্বার্থের বিরুদ্ধে রায় দিতেও পিছপা হয় না। মূলতঃ গবেষণার মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীন আমলে এ ধরনের অসংখ্য রায় ইতিহাসের পাদটীকা হিসেবে স্থান পেয়ে

আছে। ইসলামের আদর্শবাদ শুধু বায়বীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা, আর উপাখ্যানের পরিমন্ডলে সীমিত রাখা বস্তুনিষ্ঠ নয়। বরং সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে আদর্শ যাতে বাস্তব, সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে সে ধরনের প্রচেষ্টা তথা উদ্যমের নাম গবেষণা।

ইসলামী জীবনাদর্শের মৌলিক গ্রন্থ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র কালাম'– আল-কোরআন। এই পবিত্র মহান গ্রন্থে মৌলিক নীতি সমূহের উল্লেখ আছে। মুসলিম উম্মাহ্ প্রধানত কোরআন নির্ভর জনসম্প্রদায়। এর পরেও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (দ.)'র কর্ম প্রবাহে অনেক ঘটনা রয়েছে যাতে নীতি-নৈতিকতা নির্ভর বোধ-বিবেক শক্তির সজাগ দৃষ্টিভঙ্গীকে আমলে আনার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে বিশ্বনবী (দ.) হযরত মু'আজ (রা.)কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করে প্রেরণকালে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাবে তিনি ইয়েমেনে শাসনকাজ পরিচালনা করবেন?' মু'আজ (রা.) উত্তর দিলেন, কোরআন শরীফই হবে তাঁর পরিচালক।' হুজুর (দ.) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোরআনে কোন একটি বিষয় উল্লেখ না থাকলে কি করবেন?' হযরত মু'আজ (রা.) জানালেন, "হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন।" অতঃপর হাদীসে না থাকলে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন জানতে চাইলে, হযরত মু'আজ তখন বলেন, "স্বীয় বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে কাজ এগিয়ে নেবেন।" হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)'র জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে বিশ্বনবী (দ.) বলেন, "যুক্তির চেয়ে অধিক সুন্দর জিনিস আল্লাহ্ আর সৃষ্টি করেন নি।" অন্য একটি হাদীসে হুজুর (দ.)'র মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে এভাবে, "আমার পরে আর কোন নবীর প্রয়োজন হবে না এবং আসবে না, কিন্তু সংস্কারকের প্রয়োজন হবে।" উল্লেখ্য যে গতিময় পৃথিবীতে সক্রিয় এবং পরিবর্তনশীল সমাজে নীতি নৈতিকতা ধারণ করে ইজতিহাদের মাধ্যমে সংস্কারকই সব সময় সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত উম্মাহকে জ্ঞাত করেছেন। হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খিলাফত সময়ে রোম-পারস্য-ফিলিস্তিন সহ অসংখ্য দেশ বিজয়ের পর পরিচালনা ব্যবস্থাকে অংশীদারীত্ব এবং গতিময় রাখার জন্যে ইসলামের মৌলিক আদর্শের মানদণ্ড বজায় রেখে প্রায়োগিক অনেক বিষয় গৃহীত হয়েছে গবেষণার ভিত্তিতে। ইসলাম ধর্ম প্রচারক বিশেষত নিরস্ত্র অলি-দরবেশ-পীর-ফকির-কলন্দর-মস্তরা তাওহীদ প্রচারের ক্ষেত্রে সব সময় কৌশল হিসেবে বিবেক বুদ্ধি ও বোধনের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আউলিয়াদের জীবনকাহিনীতে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। এক কথায় গবেষণা হচ্ছে আদর্শের আলোকে সমস্যার নিরিখে নির্মোহ বুদ্ধি-জ্ঞান, ইতিহাস এবং আকল ভিত্তিক আলোচনা পর্যালোচনা অনুযায়ী বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পৃথিবীর যাবতীয় সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে গবেষণার প্রাধান্য সহজে অনুমিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তন ও রূপান্তর বিষয়ে বুদ্ধি, যুক্তি এবং বাস্তবতার অনুশীলন সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইংল্যাণ্ডের একটি ঘটনা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়। ইংল্যাণ্ডে যখন প্রথম উড়োজাহাজ তথা বিমানের প্রবর্তন হলো, তখন খ্রিস্টান পাদ্রীরা প্রধানমন্ত্রিকে এতে আরোহন করতে নিষেধ করেন। পাদ্রীদের মতে বিমানে চড়াটা আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নয়। যদি এটি অভিপ্রেত হতো আকাশে উড়ার জন্যে আল্লাহ্ মানুষকে নিশ্চয়ই ডানা দিতেন। এ ধরনের মনোভাব মুসলিম উম্মাহ'র অনেকের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। অথচ আমাদের উম্মাহর বিদ্বানরা মিরাজ রজনী সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। মিরাজ সম্পন্ন হয়েছে পবিত্র রজনীতে। বাহন ছিল 'বোরাক'। আরোহী ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)। বোরাককে উল্লেখ করা হয়েছে 'বিদ্যুৎ' হিসেবে। মিরাজের ব্যাপারে 'মুত্তাকীনা আলা রফ্‌রফ্' কথাটি কোরআনে উল্লেখ আছে। মুসলিম উম্মাহ্ চাঁদের দ্বিখণ্ডিত রূপের ইতিকথাও জ্ঞাত আছেন। দ্বিখণ্ডিত চাঁদের অস্তিত্ব বিশ্ববাসীর নিকট বিজ্ঞানীরাই এখন সত্য বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন। এ ধরনের একটি উম্মাহ্‌র নিকট নৈতিক মান সম্পন্ন বুদ্ধি-যুক্তির অনুশীলন যে কতো জরুরী বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধর্মের প্রয়োগ সিদ্ধতা বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা-চেতনার অভাবে বাংলাদেশের একশ্রেণির আরবী শিক্ষিতের কারণে বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে কথিত ইসলামপন্থীদের নেতিবাচক এবং ভুলকর্ম প্রক্রিয়া ধর্ম হিসেবে ইসলামকে বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি করে। পবিত্র কোরআনের সূরা ইব্রাহীমের ৪নং আয়াতে যে কোন ভূখন্ডের জনগোষ্ঠির মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত থাকা সত্বেও ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাজধানী ঢাকার কোন কোন মসজিদের নাম করা ইমামদের ফতোয়া দিয়ে সরাসরি বিরোধিতা করতে দেখা গেছে। একইভাবে ১৯৭১ সালে জনগণের রায় মেনে নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর না করে যখন বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনতার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তখন কথিত ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তান এবং ইসলাম রক্ষার নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র এবং সাংগঠনিক বিরোধিতায় সামিল হয়। এ সময় কোন প্রকার বস্তুনিষ্ঠ এবং গণমুখি আলোচনা পর্যালোচনা না করে ধর্মান্ধতায় আবেগতাড়িত হয়ে 'ইসলাম রক্ষার' নামে কথিত রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকায় ধারণা প্রাপ্তি ঘটেছে যে ইসলাম এবং দেশ এক ও অভিন্ন। তাঁরা একবারের জন্যেও ভাবেন নি যে ইসলাম আল্লাহ্ ঘোষিত মানবাদর্শ যা দেশ জাতি ভূখণ্ড এবং রাষ্ট্রের অনেক উর্ধ্বে আদর্শগত চেতনা। আর রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্টি নিজেদের সংগঠিত ও সংহত রাখার একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন ধর্মানুসারী অনেক নিরপরাধ নিরস্ত্র জনগণকে সশস্ত্র হায়েনারা

হামলা-আক্রমণ করে বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়ে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। যে কোন নাগরিককে তার স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করা যে কতো বড়ো মানবতা বিরোধী অপরাধ তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হিজরত সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আয়াত সমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেত। এতে ইসলামের অমর আদর্শই যথার্থ অর্থে প্রকাশ পেয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নতুন মাত্রার উদ্দীপনা সৃষ্টি করতো। একই সঙ্গে দেশজভাবে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কথিত সেকুলারিস্ট, ধর্ম উপেক্ষাবাদী এবং নাস্তিকদের লালিত নেতিবাচক ধারণা ও কটুক্তির পথ অনায়াসে রোধ হয়ে যেত। ধর্ম মানুষের ইহজাগতিকতার সঙ্গে জড়িত মনোজগতের গভীর বিশ্বাস জনিত অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বিশ্বনবী (দ.)'র দৃষ্টিভঙ্গী এতোই বিজ্ঞানময় ছিল যে, তিনি ইসলাম ধর্মকে শুষ্ক রীতি নীতির বাঁধনে আবদ্ধ রাখেন নি। বরং ধর্ম পালনে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র একান্ত অনুমোদনে বৎসরে দুটি ঈদের সংযোজন ঘটিয়েছেন। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার রাতকে 'শবে কদর' তথা বরকতময় ঘোষণা থাকায় রমজান মাসে 'তারাবীহ'র মতো অতিরিক্ত ইবাদতের পরেও ২৭ রমজান রাতে মুসলিম উম্মাহ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে বিশেষ নফল ইবাদত সম্পন্ন করে থাকেন। দীদারে ইলাহীর রাত হিসেবে পবিত্র কোরআনে স্বীকৃত 'শবে মিরাজ' অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও তেমন কোন আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে উম্মাহ্‌র অনেকে বিশেষ ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তা অতিবাহিত করেন। 'শবে বরাত' তথা ভাগ্য রজনী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কোন স্পষ্ট ঘোষণা নেই। অনেকের মতে এটি আব্বাসীয় শাসকদের সৃষ্টি। উৎসব, অনুষ্ঠান এবং প্রেম-প্রীতির রসঘন পারস্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্থানিক প্রভাবে কোন কোন বিষয়ে উজ্জীবিত শাসকরা মুসলিম উম্মাহর জন্যে ১৪ শাবান রাতকে শবে বরাত তথা ভাগ্য বন্টনের রাত ঘোষণা করে উম্মাহর অভ্যন্তরে ইবাদতের উদ্দীপনা সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। ইসলাম ধর্মে এটি হয়তো ইবাদত বিষয়ে নতুন সংযোজন। এ রাতে অন্যান্য পবিত্র রাতের মতোই উম্মাহর সাধারণ লোকজন মাগরিব নামাযের সময় থেকে পার্থিব সকল কাজকর্ম পরিত্যাগ করে বিশেষ ইবাদত সম্পন্নের লক্ষ্যে স্রোতের মতো মসজিদ অভিমুখে ধাবিত হন। মসজিদে মসজিদে সারারাত বিশেষ ইবাদত সম্পন্নের পাশাপাশি কিশোর তরুণ যুবক বৃদ্ধের অনেকেই অলি দরবেশ পীর বুজুর্গ এবং পিতা-মাতা সহ আত্মীয়-স্বজনের মাযার-কবর জিয়ারতও সম্পন্ন করে থাকেন। শবে কদর এবং শবে বরাতের পবিত্র রজনীদ্বয়ে মুসলিম উম্মাহ্ সমৃদ্ধ দেশ এবং লোকালয়ে জনপথ সমূহ মুসল্লিদের পদভারে উদ্দীপ্ত থাকে। এ ধরনের অনুষ্ঠান সমূহ ধর্মীয় উদ্দীপনারই একেকটি শুভ অংশ। অথচ আজকাল কোন কোন এলাকায় ধর্মীয় রক্ষণশীলতার এতো প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে শবে বরাতের বিশেষ ইবাদত বারণের লক্ষ্যে এশার নামাযের পর মসজিদের দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনায় উম্মাহ মাত্রই দারুনভাবে আহত শোকাভিভূত। শিয়া সম্প্রদায় ১০ মুহর্‌রম পালন করে নিজস্ব কায়দায় এবং অনুভূতি নিয়ে। উম্মাহর সুন্নী সম্প্রদায়ের বড় অংশটি ১০ মুহর্‌রম সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, দারুন মর্মাহত। বিষাদঘন এ দিনকেও ইসলামের মৌলিক আদর্শ উজ্জীবিত করার মানসে সুন্নীরা বিশেষ মর্যাদায় পালন করে থাকে। আজকাল দেখা যায় একশ্রেণির রক্ষণশীল ধর্মাচারীরা দশ মুহর্‌রমের পবিত্র শাহাদতকে ম্লান করার অভ্যাস হিসেবে অনেক কায়দা কানুনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছেপে থাকেন। অথচ আমীর মোয়াবিয়া কর্তৃক 'খোলাফায়ে রাশেদীন' প্রবর্তিত পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থা উপেক্ষা করে এবং পারিবারিক ও গোত্রীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিলাষের কারণে ইয়াজিদের মতো দুরাচারীকে উত্তরাধিকার নিযুক্ত করায় বিশ্বনবী (দ.)'র ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত তাঁর দৌহিত্র পবিত্র আহলে বাইত হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) তাঁর পরমাত্মীয় সহ কারবালা প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমীর মোয়াবিয়ার ব্যক্তি ইচ্ছা এবং অভিলাষ কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত এখনো বিভিন্ন বংশীয় এবং গোত্রীয় রাজা-বাদশা নামে উম্মাহ্‌র রাষ্ট্র সমূহে বলবত আছে। অথচ উম্মাহ্ অধ্যুষিত বেশিরভাগ রাষ্ট্রে চলমান এই রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্বনবী (দ.) প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অতি মর্যাদা সহকারে পালন করা হয় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)। এদিন উম্মাহ্‌র কিশোর তরুণ যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে মুসলিম দেশসমূহ এবং লোকালয় গুলোতে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া নিবেদনার্থে রাসূল (দ.) প্রশস্তি গেয়ে গেয়ে যে মহা মিছিলের আয়োজন হয় তাতে তাওহীদ পরিপন্থী ধর্ম বিদ্বেষীদের মনে হৃদকম্পন সৃষ্টি হয়। এদিন মুসলিম বিশ্বের আমজনতার মধ্যে নবী প্রেমের যে মহাজাগরণ এবং শতকোটি কণ্ঠে জনতার কল-কল্লোল দৃশ্যমান হয় তাতে ইসলাম ধর্ম বিশ্ববাসীদের মধ্যে নতুন মাত্রার উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে থাকে। অথচ এ ধরনের পবিত্র আয়োজনকে অনেকে 'বিদআত' বলে ধিক্কার দিয়ে থাকেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারে সাহাবা পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন অলি দরবেশ পীর ফকিররা। অবশ্যই সাহাবা কেরাম হচ্ছেন ইসলামের প্রথম যুগের অনন্য শ্রেষ্ঠ আউলিয়া। আউলিয়াদের অনেকের মাযার পৃথিবীর নানা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হিসেবে বিদ্যমান থাকায় সেখানে প্রতিনিয়ত তাওহীদের বিজয় ভেরী উচ্চারিত হচ্ছে। অর্থাৎ মাযার সমূহ মূলতঃ তাওহীদেরই প্রচার কেন্দ্র। তাদের অবদান স্মরণে রাখার তাগিদে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে মাযারকে ঘিরে অনুষ্ঠান হিসেবে উরস উদযাপন করা হয়। বলা হয়ে থাকে একাজ শুধু

বিদআত নয় বরং শিরিক। কারণ এ ধরনের উরস অনুষ্ঠান গান বাজনা কাওয়ালী ঢোল বাদ্য সহকারে সম্পন্ন হয়ে থাকে। একশ্রেণির ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে এ সকল বাদ্য বাজনা সম্পূর্ণ হারাম। তাঁদের রক্ষণশীল ধর্মচিন্তা, ধর্মপ্রচার প্রসারের বিষয়ে বিশুদ্ধ বলে লালিত শুষ্করীতি নীতির বাঁধন এতো দৃঢ় যে বয়োবৃদ্ধ ব্যতীত ধর্ম পালনে কিশোর তরুণরা উদ্দীপ্ত হয়ে এগিয়ে আসবে বলে ধারণা করা কঠিন। ধর্ম যেহেতু মনোজগতের একান্ত বিশ্বাস এবং প্রেরণাগত বিষয় উদ্দীপনার আনুসাঙ্গিক আয়োজন না থাকলে কিশোর, তরুণ, যুবকদের ধর্ম কর্মে সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। আমাদের ধারণায় রাখা দরকার যে কিশোর তরুণ যুবকরাই যে কোন ধর্মের ভবিষ্যত, সক্রিয় অনুগামী অনুসারী। কথায় কথায় 'শিরিক' 'বিদআত' 'কাফির' ফতোয়া যে যুক্তি ও বাস্তবতা বহির্ভূত বিষয় তা ভেবে চিন্তে বলার সময় এসে পড়েছে। মনে রাখা দরকার গবেষণা, সময় সচেতনতা এবং সামাজিক উপযোগিতা ব্যতীত কোন ধর্ম, দর্শন বা আদর্শ মহাকালের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টিকে থাকতে পারেনি। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনন্য সফল খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খিলাফত পরিচালনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ব্যাপকভিত্তিক পরামর্শ, যুক্তি-তর্ক আলোচনা পর্যালোচনা সুচিন্তিত অভিমতের ভিত্তিতে গৃহীত এবং সফলভাবে কার্যকরী হয়। খ্রিস্টান চিন্তাবিদ অধ্যাপক নোলডেকে তাই আফসোস করে উল্লেখ করেছেন, "হযরত উমরের সমাজবাদী কাঠামো টিকে না থাকাটা ইসলামের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়েছে।" খিলাফত পরিচালনায় হযরত উমরের গবেষণা নীতির সাফল্যে উম্মাহ্‌র প্রতিপক্ষরা পরশ্রীকাতরতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে উম্মাহ্‌র আপামর জনগণ বিশ্ব ইতিহাসে রাষ্ট্র পরিচালনায় এ ধরনের অতুলনীয় সাফল্য দেখে হয়েছিল আল্লাহ্‌র শোকরিয়ায় উদ্ভাসিত এবং উল্লসিত। তাই নিয়তির বিধান, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তিনি শহীদ হয়েছেন ঈর্ষাকাতর ভিন্নধর্মীর কৃপাণে। উম্মাহ্‌র বর্তমান জমানার মনীষী, আলেম, উলামা, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী মনীষী ও ফকিহ্‌দেরকে এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা এবং আপেক্ষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

মুসলিম উম্মাহ্‌র টিকে থাকার স্বার্থে এবং বিশ্বময় মানব সমাজের উপর কল্যাণমুখী নৈতিক প্রভাব বলয় সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণার গুরুত্বকে পাশ কটিয়ে চলা কখনো উচিত হবে না। মুসলিম উম্মাহ্‌র সাম্রাজ্যিক পতনের পর ইউরোপ আমেরিকা সহ পাশ্চাত্য জগত তাদের নিজস্ব কুটনীতির আদলে গবেষণা জারী রেখে পৃথিবীময় সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের উদ্ভাবিত আর্থ-রাজনৈতিক কুটকৌশলের বেড়াজালে মুসলিম উম্মাহ্ বন্দী হয়ে আছে। আমাদের ধারণায় রাখতে হবে প্রাচ্যের এক সময়ের ঘুমন্ত চীন এখন সদা জাগ্রত ব্যাঘ্র হয়ে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও কর্মশক্তি নিয়ে প্রভাব বিস্তারের হুংকার ছাড়ছে। বিধ্বস্ত রাশিয়ার শ্বেতভালুক পুনরায় পৃথিবীকে নাড়া দিতে প্রতিবেশীদের দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে তৎপরতা শুরু করেছে। হুমকি দিচ্ছে নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে পৃথিবী নামক গ্রহ ধ্বংস করে দেবে। ভারত নিজস্ব ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি অর্থনীতি বাণিজ্যিক আদলকে সম্মুখে রেখে এশিয়া ভিত্তিক প্রভাব সৃষ্টিতে চাণক্যপুরীতে (কূটনীতিক জোন) অবস্থান করে কৌটিল্য দর্শনের আলোকে নানা কৌশলে তৎপরতা চালাচ্ছে। এ সকল দেশের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস, দর্শন, আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের আলোকে রয়েছে অসংখ্য THINK TANK তথা গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

এক সময় এ সকল দেশের কথিত থিংক ট্যাংক থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ সমূহে "মৌলবাদ ঠেকাও" প্রচারণা চালানো হয়েছিল। কথিত প্রগতিশীল বাম এবং পূজিবাদী গণতন্ত্রীরা এ ধরনের স্লোগানের পক্ষে একাত্ম হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষ প্রান্তে সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক কাঠামো এবং মতাদর্শের পতন ঘটলে মার্কিনীদের কৌশল বিদ্যার পরিবর্তন ঘটে। মার্কিনীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সৃষ্ট তালেবানরা এক পর্যায়ে নিজেদের দেশজ স্বার্থে মার্কিনীদের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এক এগারোর কারণে গড় বার্তা হিসেবে মুসলিম উম্মাহ্ 'জঙ্গীবাদী' এবং 'সন্ত্রাসী' জনগোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ রূঢ় ভাষায় ভাবাবেগে 'ক্রুসেডের' ঘোষণা দেন। ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশে কয়েকদশক ধরে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট প্রকৃতির কয়েকজন একনায়কের পতন ঘটে। অথচ মুসলিম দেশ সমূহে ইঙ্গ-মার্কিনীদের সৃষ্ট রাজতান্ত্রিক শিবিরগুলো তখনো সুরক্ষিত থেকেছে। বুশ সৃষ্ট ক্রুসেডের কারণে মুসলিম উম্মাহপ্রধান কয়েকটি দেশ লন্ডভন্ড হয়ে যায়। ইতোমধ্যে পশ্চিমা বিশ্বসহ পৃথিবীর সকল প্রভাবশালী দেশের কণ্ঠ থেকে 'জঙ্গীবাদ' 'মুসলিম সন্ত্রাসী' শব্দগুলো উধাও হতে শুরু করেছে। বরং মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য সহ জাপান, অস্ট্রেলিয়া ব্লক, চীন রাশিয়া ভারত বিভিন্ন কায়দায় মুসলিম জনগোষ্ঠির সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। এদের মধ্যে কোন কোন দেশ মুসলিম দেশ গুলোতে শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রসার, সামরিক সহায়তা, উন্নয়নে সহযোগিতা, মুসলমানদের ধর্মকেন্দ্র ভিজিটের মতো কাজেও অংশ নিচ্ছে। এ সকল দেশগুলো হয়তো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে, পৃথিবী জুড়ে মুসলিম জনসংখ্যা ১৮০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ধর্ম বিশ্বাসগত হিসাবে এ সংখ্যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং বর্ধিষ্ণু-বিশাল। দ্বাদশ শতাব্দীর ক্রুসেডের পর থেকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি ব্যাপক নেতিবাচক উদ্যোগ এবং দমন পীড়নের পরেও ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের

সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ তাদেরকে নতুন ভাবনায় ফেলেছে। হয়তো এ কারণে এ সকল দেশের কৌশল পত্রে বার বার পরিবর্তন আসছে। ইসলাম ধর্মের সঠিক মূল্যতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত মনীষীরা জানেন যে ইসলামের প্রাণশক্তি হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং মৌলিক কর্ম প্রেরণা শক্তি হচ্ছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) ও পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল, খোলাফায়ে রাশেদীন, নির্মোহ-নির্লোভ সহাবায়ে কেরাম এবং জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মহান আউলিয়া সাধকরা।

আমাদের ভাবনায় থাকা প্রয়োজন যে ১৮০ কোটি মুসলিম জনসংখ্যা নিঃসন্দেহে বিশাল। একই সঙ্গে এটিও সত্য যে এ সংখ্যা পর্যাপ্ত শিক্ষা, মেধা, মনন এবং প্রাসঙ্গিক কর্মশক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। ফলে এ ধরনের বিপুল মানব গোষ্ঠীকে 'মানব সম্পদ' হিসেবে বিবেচনায় আনা বস্তুনিষ্ঠ নয়। উম্মাহ্র বিশাল সংখ্যক মানুষকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ আয়োজনের জন্যে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা অবশ্যই একটি অতি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

বিজ্ঞানময় ঐশীগ্রন্থ আল কোরআনের নির্দেশনায় অনেক আয়াত আছে চিন্তা এবং গবেষণা প্রসঙ্গে। চিন্তা এবং গবেষণার যুক্তিসিদ্ধ-বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে বলা হয়েছে ইজতিহাদ। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে ঘোষণা আছে, "তবে (যুদ্ধের সময়) বিশ্বাসীদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি অংশ অবশ্যই যুদ্ধযাত্রায় বিরত থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানলাভে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। এ জ্ঞানীরাই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যোদ্ধাদের নৈতিক সত্যজ্ঞানে সচেতন করে তুলবে। ফলে তারা অন্যায় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে"-(সূরা তওবা:১২২)। উপর্যুক্ত আয়াতের নির্দেশনায় আল কোরআনের মৌলিক সূত্র সমূহের ভিত্তিতে গবেষণা ব্যতীত মুসলিম ভাবনা, জীবন অনুশীলন হচ্ছে বিনষ্টির প্রেক্ষাপট রচনা করা। বিশ্বব্যাপী নামকরা মুসলিম দার্শনিক আল্লামা ইকবাল মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের সংকট উত্তরণের জন্যে বার বার যুগোপযোগী গবেষণাকর্ম সম্পাদনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে অলসতা, পলায়নপরতা, অন্ধ অনুকরণ, বুদ্ধির চর্চাহীনতা পরম জাগৃতি এবং সম্ভাবনার শত্রু। সমসাময়িক মুসলিম উম্মাহ্র অনগ্রসরতা, অলসতা, উদ্যমহীনতা, পর্যবেক্ষণ করে আল্লামা ইকবাল আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করেন, "ইয়ারব! দিলে মুসলিম কো ওহ জিন্দাহ তামান্না দে, জো কলব কো গরমা দে, জো রোহ কো তড়পা দে।" অর্থাৎ হে রব! মুসলমানদের অন্তরে তুমি জীবন্ত উদ্দীপনা জাগিয়ে দাও। কলবকে যা উত্তপ্ত করে, উজ্জীবিত করে নির্জীব আত্মাকে।" অতীত চর্চা, অহংকারে অলস, কর্মউদ্যমহীন নির্জীব আত্মা নিয়ে প্রায় ঘুমের মধ্যে কালাতিপাতরত মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে আল্লামা ইকবাল আত্ম চীৎকারে শোর তুলেছেন, "খুদি কো বুলন্দ কর ইতনা কে হর তাকদির ছে পেহলে। খোদা বান্দেছে পুঁছে বাতা তেরি রেযা কিয়া হ্যায়।" অর্থাৎ খুদিকে (আত্মজগরণ) এতই সমুন্নত করো; যেন প্রতিবার ভাগ্য লেখার আগে খোদা তোমাকে জিজ্ঞেস করেন, বলো কী তোমার অভিপ্রায়?"

এক কথায় অলসতা-অকর্মণ্যতা কখনো কোন জাতির উত্থানের পথ নির্দেশক নয়। অতীতের প্রতিটি বিষয় এবং ঘটনা থেকে নির্মোহ শিক্ষা গ্রহণ করে, প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের সমীক্ষা সম্মুখে রেখে, আবেগ-উচ্ছ্বাস পরিহার করে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিসিদ্ধ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুসলিম উম্মাহ্র নৈতিক উত্থানের পূর্বশর্ত। আর এ জন্যে প্রয়োজন ব্যাপক ভিত্তিক চিন্তা এবং গবেষণাকর্ম– যা উম্মাহ্র জ্ঞান চর্চার জন্যে অত্যাবশ্যক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সন্দেহাতীত বিষয়। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আমরা আল্লাহ্র খলিফার জিম্মাদারীত্বের শর্ত মেনে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম উম্মাহ্ কার্যকর অর্থে আল্লাহ্র খিলাফতের সামাজিক দায়িত্ব অবগুণ্ঠন করে ফেলেছে। মানুষ আল্লাহ্র খলিফা– কোরআনিক এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খলিফার দায়িত্ব পালন নিঃসন্দেহে সুকঠিন কর্তব্য ও সদা সত্য কর্মনিষ্ঠ বিষয়। খলিফা শব্দের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে রুহ এবং পার্থিব যাবতীয় কর্মের। শত শতাব্দী ধরে পৃথিবী আন্দোলিত হয়েছে বিভিন্ন ধারায়। এতে খলিফা'র দায়িত্ব বিষয়টি আমরা অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার সংজ্ঞায় নিপতিত করেছি। এখন আমরা 'আল্লাহ্র খলিফা জিম্মাদারী'ত্বে বহাল রয়েছি তা মনে করা বস্তুনিষ্ঠ নয়। মানুষ আল্লাহ্র খলিফা– কোরআনিক এ ঘোষণাকে জাগ্রত করার জন্যেও উম্মাহ্র ফরজ একটি কাজ হচ্ছে কোরআনের আলোকে সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত গবেষণা কর্ম চালু রাখা।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ্র নৈতিক উত্থানের প্রয়োজনে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী হালনাগাদ রেখে কৌশলপত্র নির্ধারণের জন্যে আত্মসংশোধনের পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার বিকল্প কিছু নেই। আর গবেষকদেরকে অবশ্যই সমসাময়িক ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, মতাদর্শ, অর্থ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-বিজ্ঞান জগৎ এবং বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে কাজ করতে হবে। গবেষণার প্রয়োজন নেই, গবেষণা করার মতো প্রতিভা সম্পন্ন যোগ্য লোক নেই, এধরনের অভিব্যক্তি কখনো বস্তুনিষ্ঠ নয়। কারণ গবেষণা তথা আদর্শ নির্ভর বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সমাজ বহুমুখি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের তাৎপর্যময় ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এ সত্যই বেরিয়ে আসে।

মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যে রাসূল (দ.) প্রশস্তি

আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল

'রাহমাতুল্লিল আলামীন' রাসূলে করিম (দ.) এর আলোচনাকে আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা সব সময়ের জন্য আসমান-জমিন সবখানে সমুচ্চ করেছেন (সূরা ইনশিরাহ:৪)। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবিব (দ.) এর প্রতি অবিরাম রহমত বর্ষণ করছেন এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণও তাঁর জন্য আল্লাহ্র কাছে অবিরত দোয়া করে চলেছেন। আর ঈমানওয়ালাদের প্রতিও নির্দেশ হলো– হে ঈমানদারগণ! তোমরাও রাসূলে করিম (দ.) উপর যথাযথভাবে দরূদ ও সালাম পাঠ কর"–(সূরা আহজাব:৫৬)।

আল্লাহ্র রাসূল (দ.) এর নবুয়ত প্রকাশের প্রাথমিক সময়ে যখন আরবের কাফির-মুশরিকরা কবি ও কবিতাকে ইসলামের বিরোধিতায় ব্যবহার শুরু করলো, তখন রাসূল (দ.)ও সাহাবী (রা.) কবিগণকে তাঁদের জবাব দিতে উৎসাহিত করেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, নবী করিম (দ.) হযরত হাস্সান (রা.)কে বলেছেন, কবিতার দ্বারা তাদের (কাফিরদের) দোষক্রটি বর্ণনা কর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাদের দোষক্রটি বর্ণনা করার জবাব দাও। হযরত জিবরাঈল (আ.) তোমার সঙ্গে থাকবেন"–(সহিহ বুখারী:৪১২৩)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (দ.) বলেন, "যারা হাতিয়ার দিয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের (দ.) সাহায্য করছে, কথার (কবিতার) দ্বারা আল্লাহ্ ও রাসূলের (দ.) সাহায্য করতে কিসে তাদের নিষেধ করে?–(জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা)। পরবর্তীতে সাহাবী (রা.) কবিগণ ইসলামের সুমহান আদর্শ, সৌন্দর্য, মহিমা ও মহানবী (দ.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা শুরু করেন। ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী একদল মুসলিম কবি-সাহিত্যিক আবির্ভুত হন, যাঁরা যুগের বিবর্তনে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর প্রশংসায় গদ্য, কবিতা ও গান রচনার একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন নিজ নিজ ভাষায়।

উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝিতে বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ত্বরিকা হিসেবে 'ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া' প্রতিষ্ঠা করেন হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (১৮২৬-১৯০৬)। কালের প্রবাহে তা আজ বিশ্বসমাদৃত। সুফি ও মরমী সাহিত্যের ধারায় মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারীগণের মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের সৃষ্টি। 'ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া' প্রতিষ্ঠার দেড়শত বছর অতিক্রান্ত হলেও এই ত্বরিকার উপর ভিত্তি করে মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য রচনা শুরুর ইতিহাস প্রায় একশত বিশ বছরের। এই ধারায় সর্বপ্রথম ১৯০৪ সালে 'তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার ফি দফ্ই শারারাতিল আশরার' গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা মুফ্তি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (১৮৬৬-১৯৪৪)। 'ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া'য় নির্দোষ সাধন সঙ্গীতের চর্চা থাকায় মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের দুইটি ধারার সৃষ্টি হয়। ১. গদ্য সাহিত্য এবং ২. সাধন সঙ্গীত সাহিত্য যা মাইজভাণ্ডারী গান বা কালাম হিসেবে পরিচিত।

এই পর্যন্ত রচিত প্রায় দশ হাজার মাইজভাণ্ডারী গান বা কালাম ও শতাধিক গদ্য গ্রন্থের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রাসূলে করিম (দ.) এর প্রশস্তি, নাতে রাসূল (দ.) এবং আহলে বাইতের প্রশস্তি। কারণ সুফি ত্বরিকাভিত্তিক এই সাহিত্য সমুদ্রে রাসূল (দ.) প্রেমের অলোচনা স্থান পাবে না, তা কল্পনাও করা যায় না। আর সামাহ্ মাহফিলে সাধন সঙ্গীত পরিবেশনের ক্রমধারায় দরুদ শরিফ ও মিলাদে নববী (দ.) বা তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া তথা নাতে রাসূল (দ.) পরিবেশন করা একান্ত আবশ্যক। (সূত্র: মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া, মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী)। এছাড়াও পবিত্র মিলাদুন্নাবী (দ.) মাহফিল, মাহফিলে মিলাদ-কিয়ামসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাঙালি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে নাতে রাসূল (দ.) পরিবেশনের রেওয়াজ আবহমানকাল ধরে এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রতি আরবি মাসের ২২ তারিখে ফরহাদাবাদ নিবাসী প্রখ্যাত আলেম, আশেকে রাসূল (দ.) হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম ফরহাদাবাদীকে (১৮২৫-১৯০০) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে দাওয়াত দিয়ে মিলাদ শ্রবণ করতেন। মিলাদ চলাকালে তিনি 'মারহাবা-মারহাবা' বলে ভাব-আবেগ প্রকাশ করতেন। হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম ফরহাদাবাদী (র.) আরবি-ফার্সি ভাষায় মসনবির ধারায় 'নজ্মে দিল কুশা-ফি-মিলাদে মোস্তফা (দ.)' নামে ১৭০০টি হৃদয়গ্রাহী শ্লোক বিশিষ্ট একটি মিলাদ শরিফ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত একটি শ্লোক এ রকম– "নবী হাইরান বরায়ে উম্মতে উস্থ/ আজব উম্মত-ব-ইশ্কশ্ কাহেলে ছুস্থ/ ব-ইশ্কশ্-মস্ত শো আবদুল করিমা/ জাজা-কাল্লাহু বিহি আজরান আযিমা।"

হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রধান খলিফা ও ভ্রাতুষ্পুত্র গাউসুল আযম বিল বিরাসাত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (১৮৬৫-১৯৩৭) কর্তৃক রচিত একটি ফার্সি চতুর্দশপদী কবিতাও আল্লাহ্র হাবিব (দ.) এর উসিলায় হৃদয়স্পর্শী মোনাজাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি স্বহস্তে লিখেন- "আয় খোদায়ে মন্ বাহক্কে মুস্তফা (দ.)/ আয় তোফায়লে হুরমতে আলে আবা/ আয় খোদায়ে মন

বাহক্‌কে চার ইয়ার/ হার্‌চেহ্ করদম 'অফ্'ব কুন রোযে শুমার/ রোয়ে মাহ্‌শর্ দার বা আলে রাসূল (দ.)/ আয্ তোফায়লে মুকবলাঁ গিরদা কবুল।" অর্থ- হে খোদা! হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এবং তাঁর প্রিয়জনদের উসিলায় আমি প্রার্থনা জানাই– আমার অপরাধ সমূহ ক্ষমা করো এবং হাশরের দিন রাসূলে খোদা (দ.) এর অনুসারী, বংশধরগণের সাথে আমাকে স্থান দিও। আর তোমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের উসিলায় আমার এই দোয়া মঞ্জুর কর। (মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী: একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা, মো: মাহবুবুল আলম, ২০২০)

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক, অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীও (১৮৯৩-১৯৮২) তাঁর রচিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পরিচয় ও সাধন পদ্ধতির বর্ণনামূলক মোট ১২ গ্রন্থের মধ্যে একটি হলো 'মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া' (প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৯, ১৭ স- ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২)। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রওজা ও দরবারী মাহফিলে প্রচলিত মিলাদে নববী (দ.) ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া মাহফিল, সামাহ্ মাহফিলের নিয়ম-পদ্ধতি এবং কিছু জনপ্রিয় কালাম এর শুদ্ধরূপ বর্ণনাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অন্যতম খলিফা ও মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের প্রথম লিপিকার মুফ্‌তিয়ে আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদবাদীর (১৮৬৬-১৯৪৪) রচিত রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর শানে একটি ফার্সি নাতে রাসূল (দ.) পাওয়া যায়। উক্ত নাতের পংক্তিগুলো হলো-"আই শাহে আলম মোবতালা- দর এশকেতু হুরুপরী/ জিন্নো বশর শয়দায়ে তু বর জুমলা আলম ছরওয়ারী।/ ওয়া ছ্‌পত-ছে আয়দ দর রকম কা নগুঞ্জদ দর কলম/ হার আঁছে দর শানে তু মিগুয়ম আজাঁ বালাতরী।/ ছিজে নয়াবম দর জাঁহা তাগুয়ম আন্তা মিছলাহু/ শামছো কমর গুয়াম তুরা আজাঁ রৌশন তরী।/ হোছনে তুরা জলওয়া আজব কজ আকছে আঁ আহলে জাঁহা/ মকতুনে তু একছর গুদন আইমাহে বুরজ দিলবরী/ আন্দর জাঁহা গর দিদাহ আম-বিছয়ারে খোবা দিদাহ আম/ হারগিজ ন-দিদম মিছলে তু-খুবী ব-ই খোশ মনজরী।/ তা-তু-বওয়াছপে শাহেদী দরমাহফিল জানাশুদী/ খোবাঁ আলম রাজে হাস বরদী ব-ই জলওয়াগরী।/ শয়দা আমিন বে নওয়া আজ জানো দিল বরতু ফেদা/ দারদ বদর গাহত রজা কজ্ নিছপে ছুয়শ ব-নেগরী।" (তোহ্‌ফাতুল আখ্‌ইয়ার, ২য় খণ্ড, ৩য় প্রকাশ–১৪০৭ বাংলা, চট্টগ্রাম, পৃ১১৮-১১৯) ইসলামী আইন বিশারদ এবং সর্বমোট আটটি গ্রন্থের প্রণেতা এই বিখ্যাত সুফি ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁর পিতা আল্লামা সৈয়দ আবদুল করিম ফরহাদাবাদীর মতো একজন আশেকে রাসূল (দ.)। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় শায়েরের কণ্ঠে নাতে রাসূল (দ.) শুনে তিনি অজদ হালতে (বিভোর) চলে যেতেন।

হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খলিফা বাহরুল উলুম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবুল বরকাত মুহাম্মদ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরি (১৮৬৪-১৯২৭) প্রথম মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য রচয়িতাগণের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত মোট ১৪টি গ্রন্থের (গদ্য ও পদ্য) সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত রচনা হলো–

'আইনায়ে বারী ফি তরজুমাতে গাউসিল্লাহিল আযম মাইজভাণ্ডারী রদ্বিয়ানহুল্লাহুল বারী'। এই গ্রন্থটি আরবি, উর্দু, ফার্সি ও হিন্দি ভাষার সংমিশ্রনে গদ্যে-পদ্যে রচিত। প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের প্রথম রচনা যা লেখক স্বীয় মুর্শিদ হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অনুমতিক্রমে লিখেন। এতে তিনি কুরআন-হাদিস, ইজমা-কিয়াস এর ভিত্তিতে ত্বরিকতের সুক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ উপস্থান করেছেন এবং স্বীয় মুর্শিদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। এই–গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- লেখক এখানে স্থানে স্থানে স্বরচিত গজল-কসিদা-শে'র ইত্যাদি সংযোজন করেছেন। তিনি লিখেছেন– 'মোহাম্মদই (দ.) ওয়াহদাতের রহস্য, ওই রহস্যের কে কি বুঝবে?/ যদি খোদর বান্দা বুঝে! কি বুঝল সেই খোদাই বুঝবে/ যদি না থাকত শিষ্টাচারিতা এলোমেলো শ্রেণীবিন্যাস/ মোহাম্মদকে (দ.) খোদাই বুঝে, খোদাকেও মোস্তফা বুঝবে/ প্রথম তিনি শেষও তিনি, গুপ্ত-ব্যক্ত সবই তিনি/ এটাই তাঁর গুপ্তভেদ ইঙ্গিত অন্য কেবা কি বুঝবে/ তিনি স্বভাবের প্রারম্ভিকা, তাঁর মধ্যেই শেষ যবনিকা/ তিনিই সেই অনন্ত সখা, যে বুঝবে সেই বুঝবে/ হায় তোমায় কি বলবো তিনি কেমন গুপ্তধনের ভাণ্ডার/ বন্দেগীর পোশাকে তিনি খোদারি বিকাশ বুঝবে/ ওয়াহদাতের বেষ্টনকারী ওই অনন্ত সাগরের সরাব তিনি/ দোজাহানকে ওই সাগরের এক অস্থায়ী ঠাঁই বুঝবে/ যাতে মুহাম্মদ এমন সূর্য যেটা কভু অস্তমিত হবার নয়/ উভয় জাহানে ঐ সূর্যের এক-একটি প্রতিবিম্ব বুঝবে/ ওহে মকবুল! খোদা হতে ভিন্ন কখন ছিলেন রাসূল/ মূল লক্ষ্যে পৌঁছবেনা যে উভয় জনকে ভিন্ন বুঝবে।" (অনুবাদক: মাওলানা এস.এম.এম সেলিম উল্লাহ, মাসিক আলোকধারা, জানুয়ারি ২০২১,পৃ.১৭)। অন্য একটি কালামে তিনি সম্পূর্ণ রূপকভাবে জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে মহানবী (দ.) এর আগমন এবং তাঁর দ্বীনের দাওয়াতে কিভাবে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তার বিবরণ পাওয়া যায় এভাবে– "নিশি অবসানে, আসি বন্ধু বাগানে, বাজাল মোহন বাঁশি রে/ বাঁশরীর স্বরে, নিল প্রাণ হৈরে, চলি গেল মধুর হাসি রে/ চপল চঞ্চল, নয়ন পাগল, করি গেল বন্ধুয়া আমারে/ না বুঝে চঞ্চলে, না মানে পাগলে, ঘরের বাহির হল সে উদাসী রে...।" এছাড়াও আলা হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী 'জলওয়ায়ে নুরে মুহাম্মদী (দ.)' নামক একটি স্বতন্ত্র রাসূল (দ.) প্রশস্তি গ্রন্থ রচনা করেন, যা এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

হযরত মাওলানা কাঞ্চনপুরীর অনুজ ও হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খলিফা বাহরুল উলুম হযরত মাওলানা

শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (১৮৭০-১৯০৫) মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং ত্বরিকা সম্পর্কে সর্বপ্রথম গান, গজল বা কালাম রচনাকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাইজভাণ্ডারী গান বা কালাম রচনা করেন। তিনি গান বা কালাম রচনা করে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) শুনাতেন। হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক.) মনোনিবেশ সহকারে সেই গান বা কালাম শুনতেন। তিনি এই সব গান বা কালামকে 'মসনবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মাঝে মাঝে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর গানের মধ্যে সংযোজন বিয়োজনও করতেন। তাঁর রচনাগুলোকে একত্রিত করে 'মাওলানা হাদী: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র' নামে 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট'-এর তত্ত্বাবধানে মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা সংস্থা 'আলোকধারা বুক্স' হতে ২০১৭ সালে প্রকাশ করা হয়। এতে তাঁর মোট ৯৪টি গান বা কালাম সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর রচনায় মুর্শিদের প্রেম-ভালবাসা-ভক্তির কথায় পরিপূর্ণ হলেও সেখানে রাসূল (দ.) এর প্রশংসাও পাওয়া যায়। তিনি বলেন– "আয় দিলবরে মাহে লকা মেরে তরফ কো দেখনা/ আই বাহরে হাবিবে কিবরিয়া, মেরে তরফ কো দেখনা।" অন্য কালামে তিনি বলেন– "নবীজির দেখা পাইলে, পড়িয়া চরণ তলে/ শোকরিয়া আরজ করিব আপনার।" তিনি আরো বলেন– "আরব সরদার, মুহাম্মদ মোক্তার/ নবী সকলের নবী সংসারে প্রচার।"

হযরত মাওলানা কাঞ্চনপুরীর আরেক অনুজ ও হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর খলিফা হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুস সালাম ভূজপুরী (১৮৮০-১৯৪৯) তাঁর 'রত্নবিন্দু' গ্রন্থে আল্লাহ্র পেয়ারা হাবিব (দ.) এর শানে লিখেন– "আয় ছরওয়ারে হার দো জাঁহা করতু নজর ইছ খাকে পর/ বাহারে মোহাম্মদ মোস্তফা পয়গম্বরে জিন্নো-বশর/ অয়রানা হায় খাকী ওতন তুঁহে দিলো জান আওর মন/ বাহরে গণি ছিদ্দীকো ওমর অয়রানা দেল আবাদ কর/ ইশকো মুহাব্বত গায়রকা আয় সৈয়্যদী মুঝকো ছোড়া/ বাহরে আলী ও ফাতেমা অশোহদায়ে ওহুদ ও বদর/ বাহারে এমামায়নে হুমা, কর আপু মেরে হার গুনা/ গরতু ন করি তো কৌন হে, বোলে ওহাঁ জু খায়র ও শর/ গরতু করে একহী নজর ইস ছালামে নাপাক পর/ হুঁ ময়ঁ গনি-এ দোজাহাঁ অরনা হুঁ ময়ঁ শমছো-কমর।"

হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আরেক খলিফা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক হারবাংগীরি (ইন্তিকাল ১৯২৫/২৬) তাঁর রচিত 'ওফাতনামা'য় (রচনাকাল ১৯০৬) মহানবী (দ.) এর সৃষ্টি ও তাঁর সাথে হযরত গাউসুল আযম জিলানী (ক.) এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখ করেন– "নিজ জ্যোতের জ্যোতি দিয়া সৃজিল মহাম্মদ/ মহাম্মদ শুদ্ধ সাঙ্গ পীরিতের হদ/ পুষ্প লক্ষে মহাম্মদ রেণু মহিওদ্দিন পীর/ গোলাব আতর মাইজভাণ্ডারী সুগন্ধি শরীর/ গওছল আজম খোদার প্যারা নবীর জীবন।" তিনি 'ফকির উল্লাস'-এ (রচনাকাল ১৯০৭) মহানবীর (দ.) সৃষ্টি এবং অন্যান্য সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করে উল্লেখ করেছেন– "নিজ নুরে সৃজিয়াছে তন মোহাম্মদি/ প্রভুর নুরে মোহাম্মদ পিরিতির হদ, জান মাত্র সার/ দোস্তের নুরে সৃজিয়াছে সয়াল সংসার/ বাহানা করিয়া প্রভু জীব রূহ কৈরাছে সঞ্চার/ আহাদ নামেতে প্রভু আহমদ প্রচার/ মিম উপলক্ষে করি তাতে ভারি রাখিছে পহরি/ অন্তসপুরে সন্য বরে সরূপে সোন্দরী/ সন্য বরে রাখিয়াছে প্রেম আশে সাধিবার কারণ/ মধ্য ভাগে মোহাম্মদের দিত্তার সৃজন/ মিমের দিত্তার যে পার হইয়া গেছে, মিসে গেছে, ফকির দর্ব্বেশ/ এক কাএয়া এক ছাএয়া মিসিছে বিশেষ।" (ফকির উল্লাস ও ওফাতনামা, আলোকধারা বুক্স, ২০১৯)

অতি সম্প্রতি "জুম্লে আম্বিয়া ও জুম্লে আওলিয়া" নামে তাঁর রচিত আরো একটি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। এর মধ্যে মোট ৫৩টি কালাম রয়েছে। যার প্রথম সাতটি কলাম– হামদ, নাতে রাসূল (দ.), প্রধান ফেরেশ্তাগণ, চার খলিফা, হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং হযরত বেলাল (রা.) এর শানে রচিত। বাকিগুলোতে অন্যান্য নবী-রাসূল (আ.) এবং আউলিয়া কিরামগণের শানে রচিত। তিনি আল্লাহ্র রাসূল (দ.) এর শানে বলেন, "মাওলাজির প্রধান রছুল ২/ ত্রিজগতে সহ নাহি নবির সমতুল/ প্রভুর মিত্র নুর নবি, অতুল দিনের খুবি, তান পদাশ্রয় বিনে কে পাইবে কুল/ আউয়াল আখেরি নবি, জাহের বাতুনের খুবি, ত্রিজগতে নুর নবি সৃষ্টি কৈল্য মূল/ নবি রছুল পয়াগাম্বর, এই তিন কর্ম্মে বড়, নবি সকলের নবি, জান মাত্র মূল/ যাহার দামান ধরি, পাতকি যাইবে তুরি, হেনজীর নাম, মহিমা অতুল/ নবিজীর নাম স্মরণে, পাপ নাশে সর্ব্বক্ষণে, এই ত্রিভুবনে নবি জিনি পুষ্প সমতুল/ হয়াতে মউতে নবি, আখেরে আখরতের খুবি, নবিজীর শ্রীচরণে ভকতি বহুল/ রছুলুল্লার প্রেমশ্বরী, বলে দাস হাড়বাঙ্গিরি, শূন্য ঘট পূর্ণ কর দিয়া চরণ ধুল।"

প্রধান ফেরেশতাগণের মর্যাদা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মাওলাজির হুকুম বরদার/ এছারি ফেরেস্তা চারি কর্ম্মে অধিকার/ জিব্রাইল পয়গমের ভার, ইশ্রাফিল শিঙ্গা অধিকার, মিকাইলে জলবচ্ছে হুকুমে আল্লার/ রবিসুতে প্রাণ হরে, জীব জন্তু সভানেরে, উচিলায়ে কর্ম্ম করে বাহানা খোদার/ জীব্রাইল, মিকাইল, ইছরাইল, আজরাইল, আর অপরূপ দূত বাতুনের মাঝার/ প্রভুর আজ্ঞা শীরে ধরি, যথা আছে মিত্র নুরি, পয়গাম পাঠায় মহাদুত রায়বার/ মাওলাজীর হুকুম প্রতি, পায়ে মাত্র করে গতি, এই মতে ফেরেস্তার নিয়মিত... / আজরাইল প্রাণ হরে, জীব জন্তু সভানেরে দেখিতে না পারে কভু প্রাণের আকার/ নর ঘটে বিধির স্থান সত্য শাস্ত্রের প্রমাণ, আপনাকে চিনিয়া প্রভুর করয়ে দিদার/ হারবাঙ্গিরী দাসে বলে, গাউছ ধনের পদতলে ফেরেস্তার নামে গজল শুন বারেবার।"

খুলাফায়ে রাশেদার মর্যাদায় তিনি বর্ণনা করেন, "নবিজির

সুহৃদ অন্তর/ এছাবি আছহাব সত্য প্রসিদ্ধ বরতর/ শরিয়তের ওমর কাজি, তরিকতে ওছমান গাজি, হাকিকতে আবুবক্কর মারফতে হায়দর/ এচারি নবির সুহৃদ, আবুবক্কর প্রথম মুরিদ, মুসলমান হতে নিস্বরে নিরন্তর/ নবি ম্যারাজ করি চলি আসি নিজ পুরি, ম্যারাজ তলকীন হল খোদার দোস্তবর/ ম্যারাজ করি আসি ভাবাগুণা করে বসি, জঙ্গলে লই গেল আলী নবি একাশ্বর/ আলীকে জঙ্গলে নিয়া তলকিন করায় গিয়া, জোশেতে মাতিল আলী আর্শ বরাবর/ কত পাহাড় পর্ব্বত আদি ভাঙ্গি চুর্ণ করি নদী তা দেখিয়া হজরত নবি ভাবে মনান্তর/ নবি নুবয়তের জোরে আলীকে দেখিয়া করে, হুসকরাইল নবি দরি সের নর/ সে অবধি হন্তে জান, ফকিরি অমূল্য ধন, আর দিন বুজর্গী হবে রোজ মহাশ্বর।"

নবী (দ.) দুহিতা হযরত সৈয়দা ফাতেমাতুজ্জাহরা (রা.) এর মর্যাদা এবং হযরত আলীর (রা.) সাথে তাঁর সাংসারিক জীবনের ঘটনা উপস্থাপন করে তিনি বলেন, "বিবি ফাতেমা রছুলের দুহিতা প্রধান/ ত্রিজগতে সহ নাই ফাতেমা সমান/ প্রভু যারে মা বলিছে, জগতে বলয়ে পাছে, আলীর ঘরনী হাচন হোচনের মা জান/ রূপের তুলনা নাই, জ্ঞানের অসিমা সেই, হুর নুর জিনি রূপ অপূর্ব্ব বাখান/ সপ্ত জামা গায় ছিল, কেহ রূপ না দেখিল, হাচনে হুচাইনে কিঞ্চিত করিল বাখান/ আবুবক্করে শুনি, আলিকে কহিল পুনি, সেই অবধি ত্যাগে খানা আলী পায়লেয়ান/ বিবি ফাতেমা কুমারি ময়না পাখীর রূপ ধরি, আজব সনে নানারঙ্গে আলী হয়রান/ পন্থে এক রূপসিনী, রুটি পাকায় বসি তিনি, গলে হাইকল কানে লুলক, মাথায় তাজের সান/ শেষে মসজিদে গিয়া, জগত মাতা বুড়ি হইয়া, খাটেতে শুইয়া আছে লাশের প্রমাণ/ আলীর কাগতী শুনি, ফাতেমায় কহে পুনি, খাট লাড়ি প্রবেশ করি দেখহ নয়ান/ খাট তুলিবারে চায় যত শক্তি আছে গায়, সরমিন্দা হইয়া আলী পায় অপমান/ পৃথিবী উঠাইতে পারি, খাট হেলাইতে নারী, গোস্যাবরে সিনাতক তুলে খাট খান/ চাতুরি করিয়া বুড়ি, বলে তুমি চাহ ফিরি, মোর হস্তের নীচে হেরি করহ অন্বেষণ/ সে বুড়ির হস্তের নিচে নজর করিয়া পাছে ইত্যাদি খোদার কুদরত দেখিয়া হয়রান/ লাচার হইয়া আলী, ঘরে ফিরে যায় চলি, জিজ্ঞাসিল জগৎ মাতা পন্থের প্রমাণ/ দুঃখিত হইয়া বলে, রূপ মোরে না দেখাইলে হাসর তলক না ছাড়িব অয় মেহেরবান/ তবে ফাতেমায় আসি, তিন জামা খুলে বসি হযরত আলী ঢলিয়া পড়ি হইল অজ্ঞান/ আর চারি জামা খুলিত তৈলকে প্রলয় হইত, হেনকালে গাইবি আওয়াজ পড়ি গেল নিদান/ গাউচের আমিনে বলে ফাতেমার পদতলে চরন্দীপে আছি মাতা হই হতজ্ঞান।"

জান্নাতি যুবকগণের সর্দার হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং হযরত বড়পীর গাউসুল আযম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর মর্যাদার বর্ণনা উপস্থাপন করে গীতিকার বলেন, "বিবি ফাতেমার প্রাণ হাচন হোচন/ হজরত নবির নাতি আলীর নন্দন/ প্রভু যার নাম রেখেছেন সেই নামের কি তুলনা আছে, আর্শ সর্গ মত্য পাতাল যেই নামে রৌশন/ এমাম হোচনের বংশ রুমের পাদসা প্রধান অংশ, ইমাম হাচনের বংশ বড় পির যসন/ পিরান পির মসহুর আছে, বোগদাদ সহর বিছে নামের গুণে উদ্ধারিব যত শিষ্যগণ। প্রধান আউলিয়া তিনি এস্কবাজ লা ছায়ানি, দাসগণ পার করিতে সৃজিছে নিরঞ্জন/ দিনহীন হাড়বাঙ্গিরী ইমামের প্রেমশ্বরী, হাসর অবধি আছি গাউছের চরণ।"

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রা.) এর শানে তিনি লিখেছেন, "বিল্লাল আছহাব নবিজির/ জাহেরাতে করারিয়ত বাতেনে অস্থির/ খানেকাবার মসজিদে, আজান ফুকারয়ে নিত্য, আর্শের কোরছির পরে হইত জাহির/ অশুদ্ধ আজান ফুকারে, তাতে তুষ্ট কর তারে, আছহাব সকলে বলে দোছরা খাতির/ ভাল ময়াজ্জিন হইলে, বিল্লালেরে ত্যাগিলে, অশুদ্ধ আজানে পুরা না করে তাছির/ কাঁরি মুয়াজ্জিম রাখি, খুসি হল দেশিবাসী, বিল্লালেকে ত্যাগ করা অশুদ্ধের খাতির/ নূতন কারির আজান শুনি, প্রশংসা করয়ে পুনি, ফজর না হয় রাত্রি রহিলেন স্থির/ নবি নব্যুয়তের জোরে ফুকারে বিল্লালের তরে, আপনে আজান দাও মৌলাজির খাতির/ বিল্লালে আজান দিল, তবেশে ফজর হল, অশুদ্ধ আজানে কেন করিল তাছির/ বিল্লাল আজান শুনি, আর্শের ফেরেস্তা পুনী, নামাজ আদায় কারে সকলি হাজির/ গাউচের আমিন হাড়বাঙ্গিরী, বেল্লাল প্রেমশ্বরী, দিলের মালীক পরওয়ারদেগার হাজির নাজির।" (গীতিকারের বানানরীতি হুবহু রাখা হয়েছে। গ্রন্থের কপিটি অনেক পুরাতন হওয়ায় কিছু স্থানে শব্দ অস্পষ্ট হয়ে গেছে)

হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আরেক বিখ্যাত খলিফা, রুমিয়ে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা সৈয়দ বজলুল করিম মন্দাকিনী প্রকাশ: করিম বক্স (১৮৮১-১৯৫৩) অনেক নাতে রাসূল (দ.) রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো– "এয়্যা রব্বানা এলাহীনা ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ ছল্লে আলা নবিয়েনা ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ ছল্লে আলা ছৈয়দেনা নবীয়েনা শফিয়েনা/ মাওলাও মোলযাউনলেনা, ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ ভক্তি ভরে বলে সবে ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ সুধা মাখা কথা ভবে ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ তিনি পাপ-তাপ হারি, তিনি জগত কাণ্ডারী/ বলে হুরী নূরী নারী ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ নবিকুল অগ্রগামী অলিগণ অন্তর্যামী/ খাতেমুল আম্বিয়া নামি ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ খোদাতালা বলে বল, শুনহে বিশ্বাসী দল/ আমি বলি তুমি বল ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ চাহ তাঁরি ভালবাসা রাখ যদি ত্রাণ আশা/ মনে রাখ এই ভরসা ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ এই নামের মহিমা বড় এই নামেরী আশা ধর/ এই নাম জপনা কর ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ এই নামের বিরোধী যারা চির দূরাদৃষ্ট তারা/ নাম শুনিয়ে দেয়না সাড়া, ছল্লে আলা মুহাম্মদীন/ কাঙ্গাল করিমের কথা, নবিজী হয় জগত্রাতা/ প্রভু কৃপা শান্তি দাতা, ছল্লে আলা মুহাম্মদীন।" (মাওলানা মন্দাকিনীর মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র, ২০১৯, পৃ.২৩)

অন্যস্থানে তিনি রূপকভাবে বলেন, "টিকেট দিয়ে হুকুম দিবে, চড়তে গিয়ে নেচে নেচে/ রসূলপুরে আছে পুনি, টিকেটাদীর

প্রদর্শনী/ তথা হন্তে একই চালে, যাবে এলাহাবাদের বিচে।" (প্রাগুক্ত, পৃ.২৪) অর্থাৎ ইলাহকে পেতে হলে আগে রাসূল (দ.)কে পেতে হবে।

তাঁর 'তরঙ্গ মালা' গ্রন্থে একটি উর্দূ নাতে রাসূল (দ.) এর শুরু করেছেন এভাবে, "ছালাতুল্লাহ ছালামুল্লাহ, আলারূহে রছুলিল্লাহ/ ছালাতুল্লাহ ছালামুল্লাহ, আলানুরে নবীয়ীল্লাহ...।" (প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪)

তিনি 'শেষ জীবন' গ্রন্থে দুটি উর্দূ কালামে রাসূল (দ.) এর প্রশস্তি গেয়েছেন। তার একটি হলো– "শায়দা হোঁ দেলোজাঁ ছে রছুলে আরবী কা/ হাশেমী মক্কী মদনী মোত্তলবী কা/ জু জাদ্দ হায় হাছনায়ন কা আওর ইব্‌নে জবিহায়ন/ আলম পে জিছে ফখর হায় ওয়ালা হাছবী কা/ খালেক নে খলায়েক পে যিছে কর দিয়া মমতাজ/ মছনদ হুয়া কোরআন খোদা আলী নছবী কা/ হক জল্লো আলা জিন্‌কে ছানা খাঁ হায় হামিশা/ এলান কিয়া জা-বজা শানে নববী কা/ তওরিতো জবুর আওর হায় ইঞ্জিল ভি শাহিদ/ ছব আম্বিয়া কায়েল হায় ইউশানে আজবী কা/ আওলীয়া আব্‌দালো অলি জুমলা মশায়েখ/ ছব ময়ে ফরো- জাঁ হাঁয় উছ এক নূরে নববী কা/ জব নূরে নবী চেহ্‌রায়ে আদম নে থা তাবাঁ/ মল্‌য়ুন হায় ইবলিস ছবব বে-আদবী কা/ জব খতমে রছুল ছাকীয়ে কাওছর হুয়ে হযরত/ হুরানে জন হাঁয় ফেদা উছ খোশ খবরী কা/ জব দিলমে হুয়ী খাহেশে দিদারে মুহাম্মদ/ খাহেশ ন রাহী জানমে জন্নত তলবী কা/ হিজরত ছে তেরি আয় শাহে লাওলাক হোঁ বেজাঁ/ আফছানা হায় আলম মে মেরি মোজতরবীকা/ আয় মোর্শেদা মাওলায়ে মাইজভান্ডার খবর লো/ ইয়ে করিমে জার কি ইউঁ বেছববী কা।"

তাঁর অন্য একটি শে'র হচ্ছে– "হাছি হো তোম হাছিনানে জমি কা বাদশা তোম হো/ হাসিনানে বেহেশ্‌তে বরতরী কা মোকতাদা তোম হো/ তেরে হোছনো মালাহাত মে করে কেয় হাম কলমরাণী/ খোদা খোদ হায় তেরে মদ্দাহে মমদুহে খোদা তোম হো/ তোমারে হোছন রে জররে মাহো খোরশীদো ছয়ারে/ মলায়েক হুরো গেলমা কে রফীকে দেলরোবা তোম হো/ জামালে ইউছুফী কো কেয়া তোমারে হোছনছে নিছবত/ উহ মরগুবে জলিখা আওর হাবীবে কিবরিয়া তোম হো/ তুঈ হায় ছাহেবে লাওলাক তোম হো মালেকুল আলম/ খালায়েক মে তু আফযল হায় এমামুল আম্বিয়া তোম হো/ শাফাআৎ করনে আয়ে জু দরে দরবারে মাহ্‌শর মে/ গুনাহগারানে উম্মৎ কে মুহাম্মদ মোস্তফা তোম হো/ নবুয়ৎ তেরি বা আযমৎ কেয়ামৎ তক রহে বাকী/ তু খতমুল আম্বিয়া হো আওর এমামুল আছফিয়া তোম হো/ ব-তবদীলে বেলায়াৎ ইয়ে নবুয়ৎ আপ্‌নি রাখ ছোড়ী/ বদস্তে আওলিয়া আওর পেশোয়ায়ে আওলিয়া তোম হো/ আলাম নশরাহ কি ছুরতমে কওয়ায়েফ তেরে ছিনেকী/ বযাহের হো বনী আদম খোদা জানে কে কেয়া তোম হো/ তেরে হাতোঁ রমুযে আলমে উলবী ও ছিফলী হাঁয়/ পনাহে বেকছাঁ ছকলায়ন কা মুশকেল কোশা তোম হো/ রেছলৎ তেরী গওছিয়ৎ নবুয়ৎ কুৎবীয়ৎ বন্‌কর/ রহেগী তা আবদ বাখী ছভীকা মোকতদা তোম হো/ ব-শানে আউলিয়া উল্লাহ্ নমায়াঁ হোকে তোম জা-জা/ খোদ আপনে হাফেজ দী হো যেহি নুরুল হুদা তোম হো/ কভী বগদাদ মে আজমীর মে ভান্ডার মে ফের তোম/ করিমে বেনওয়া কা মাওলা আলম মোকতদা তোম হো।" (বানানরীতি মূল গ্রন্থের অনুরূপ। প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬-৬৭)

মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য পরিমণ্ডলে বিংশ শতাব্দির শুরতে গাউসুল আযম বিল বিরাসাত হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারির (ক.) খলিফা কবিয়াল শ্রী রমেশ শীল প্রকাশ রমেশ ফকির (১৮৭৭-১৯৬৭) এর আবির্ভাব। ২০০২ সালে একুশে পদকে ভূষিত এই গীতিকার মাইজভাণ্ডারী মরমী সাধন সঙ্গীতকে পল্লী ও শহর অঞ্চলে সমান তালে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তুলেন। তাঁর রচনায়- আহমদ-আহাদ রহস্য, সামাহ সম্পর্কে হাদিসের উদ্ধৃতি, আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসা- ইত্যাদি বিষয় বারবার উঠে এসেছে। সাধক প্রেমে বিভোর হয়ে নাচার সময় যে তাঁর দুনিয়াবী কোন হুশ থাকে না সে দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন- "রসূল করিম ইছিম দিল হযরতে ঠাই/ আলি নাচে ইছিম পাই" (রমেশ শীল: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র, পৃ.৬৫)। প্রেমের মাধ্যমেই খোদা-রাসূল (দ.) পাওয়া যায়- "প্রেম খেলাতে হলে নিপুণ খোদা রসূল পাওয়া যায়" (প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫)। আহমদ ও আহাদের গূঢ় রহস্য বর্ণনায় তিনি বলেন- "নূরের মালা গলায় দিয়ে রমেশেরে দাও সাজায়ে/ আহাম্মদের ম ঘুচাইয়ে দিও মাওলা ধন।" (প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭), "গোপনে আহাদ হইয়া, আহাম্মদের ঢাকনি দিয়া" (প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭), "আহাদ আর আহাম্মদের খেলা বুঝতে শক্তি আছে কার" (প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯), "মিমের পর্দা উঠাইলে দেখবি ওরে মন/ রাম রহিম কৃষ্ণ করিম মূলেতে একজন/ আহাম্মদে আহাদ পাওয়া, আহাম্মদ আহাদ হওয়া/ মনছুরে আনলহক কওয়া সেই কথার কারণ" (প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭), "হুজুরি ক্বলব হবে মিম ঘুচিবে আহাম্মদে আহাদ হয়" (প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২), "আহমদ গঞ্জের ঘাট ছাড়িয়া রে ও মাঝি ভাই আহাদগঞ্জে নিও/ আসল ধনির লাগত পাইলে রমেশকে দেখাইও" (প্রাগুক্ত,,পৃ.১৭৪) "আহাদ আহাম্মদ যাবে এক হইয়া" (প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৬)। সামাহ্ মহফিলের পক্ষে হাদিস শরিফ থেকে শরয়ী দলিল উল্লেখ করে তিনি বলেন- "বন্ধুগণ আশেকিদের ছেমা পরম ধন।/ ছেমা বিনে কোন দিন হয়না মারফত সাধন / ধনীর আধা দিন আগে ছেমাকারী বেহেস্তে যায়/ এই খোশ খবর নবীর কাছে বলে জিব্রাইল ফেরেস্তায়/ নবী বলে শেয়ের পড়িতে কে পার বল এখন? /বন্ধু একজন উঠে বলে যদি আপনার হুকুম পাই/ শেয়ের কচিদা পড়তে আমার কোন রকম বাধা নাই/ নবী করিম হুকুম দিল দলিলে আছে বর্ণন/ সেই শেয়েরে আছাহাব আর রছুলুল্লাহর অজ্‌ধ হয়/ আওয়ারেফুল মোয়ারেফে লিখা আছে সেই বিষয়/ ছেমা যারা নাযায়েজ কয় তারা আশেকির দুষমন/ বিবি আয়েশার

পালক মেয়ে বিয়া দিল আনসারে/ আনসারে গান ভালবাসে নবীজি কালাম করে/ পাঠায় গায়িকাগণ ত্বরা করে আনছার সন্তুষ্ট কারণ/ আলী একদিন মছল্লিকে তৌহিদের ভেদ বুঝায়/ হজরত হারেছা অজ্‌ধ করতে লাগল সেই জাগায়/ ঘুরি ঘুরি নাচনা করে যেমন পতংগের মতন/ নবী করিম গিয়া নমাজ খতম যখন করিল/ এতক্ষণ কোথায় ছিলা হারেছাকে পুছিল/ নমাজে শরিক হতে পারিলেনা কি কারণ/ হারেছা কয় আল্লার আর্শে নূরের সংগে মিশে রই/ নমাজ ক্বাজা হয়ে যায় এই জ্ঞান আমার ছিল কই/ এই ছেমাকে নিন্দা করে বে-আমলি আলেমগণ/ রমেশ বলে প্রমাণ বহু আরবের মেয়েরায়/ দফ বাজায়ে গান করে শুনে নবী মুস্তাফায়/ পীর মুরিদে এক থাকিও আর কিছু নাই প্রয়োজন"- (প্রাগুক্ত, পৃ.৯০-৯১), "খোদার ভাবে নাচ গানেতে দোষ কি আছে বলনা/ একদিন বিবি আয়শা বহু নারী সঙ্গে নিয়ে গান করে/ শরার ভাবে হারাম বলে, বলে আবু বক্করে/ তাতে রসুলল্লা জায়েজ দিল মেশকাত শরীফ দেখনা" (প্রাগুক্ত, পৃ.৯১)। রাসূলের (দ.) আশেক ওয়াইজ করনী (রা.) কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন- "অদেখা রাছুলের আশেক ছিল ওয়াজকরনি, ... খোদার আশেক নবী তুমি নবীর আশেক জানি/ তোমার আশেক করলে মোরে কি কমে কও শুনি"- (প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭-৯৮), "ছিল ওয়াজ করনি, নবির দাঁত পড়ে শুনি/ নিজের দাঁত ফেলিল জানি হাবিবের তরে"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১২২), "এস্কের গুণে ওয়াইজ করনি হজরতের জুব্বা পায়"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬)। মিরাজের মূল কারণ আল্লাহ্ ও তাঁর হাবিব (দ.) এর মধ্যে ভালবাসা- "নবিজীর মেরাজের বয়ান এস্কের কারণ"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯), "আল্লারছুল বাধাঁ আছে প্রেমের সন্ধানে"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৬), "রছুল যায় খোদার দিদারে মেরাজের সময়/ নব্বই হাজার কালাম কয়, ষাইট হাজার তার গোপন রয়"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬)। রাসূলের (দ.) নির্দেশ নিজেকে চিন- "মন আরফা রছুল বাণী রমেশ বলে সত্য জানি/ নিজকে নিজে লও চিনি এই কথাটি রাখ"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪), "মন আরফা নফছহু জিকির করি/ ফকত আরফা রব্বাহু কোরানে জারি"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮)। মদিনার প্রতি তাঁর ভক্তি- "তুমি আমার কাবা কাশী, তুমি আমার মদিনা"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩)। কলেমার বাণীতে রাসূল (দ.)- "কলমা লা এলাহা ইল্লাল্লাহ জপ চিরকাল/ মুহাম্মদ রছুলআল্লা এই কলেমা আউয়াল"- (প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪)। উম্মতের কাণ্ডারী রাসূল (দ.)- "আগের পয়গম্বর গণে, এয়া নফসি উচ্চারণে/ এয়া উম্মতি বলে ছিল নবি মোস্তফায় (দ.)"- (প্রাগুক্ত, পৃ.২০৪)। নায়েবে রাসূল (দ.) এর পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন- "এলহাম্ প্রাপ্ত হয়না যারা, রছুলের নায়েব নহে তারা" (প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫)। নবীর (দ.) নুর, খোদার নুর প্রাপ্তিরস্থান মাইজভাণ্ডার- "নূরে নবী নূরে খোদা ভাণ্ডারমে সবচিজ মিলে"- (প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮)।

এভাবেই মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার সাধকগণ তাঁদের রচনায় আল্লাহ্‌র প্রিয় হবীব (দ.) এর শানে প্রশস্তি গেয়েছেন, যার কিছু অংশ উপরে উল্লেখ করা হলো। বর্তমানেও চলমান এই ধারায় মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যে আল্লাহ্‌র হাবীব (দ.) এর প্রসংশা, তাঁর পবিত্র সিরাতের আলোচনা ও নাতে রাসূল (দ.) বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট' কর্তৃক প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্র। এছাড়াও সম্প্রতি মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা সংস্থা আলোকধারা বুকস কর্তৃক 'ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) সংকলন" নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছে। মদিনার সনদ, সিরাতে রাসূল (দ.), ঈদে মিলাদুন্নাবী (দ.) এর শরয়ী দলিল, রাসূল (দ.) এর নাম মোবারকের রহস্য, পবিত্র কুরআনে রাসূল (দ.) এর প্রশংসা ইত্যাদি বিষয়ে ১২ জন লেখকের গবেষনামূলক প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। এই স্রোতধারায় অতীতের মতো মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারী লেখক, গবেষক ও গীতিকারগণ তাঁদের রচনায় মহানবী (দ.) এর প্রশস্তি করে চলেছেন বর্তমানেও।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আল-কুরআন।
২. সহিহ বুখারী।
৩. মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া, মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, ১৭ তম সংস্করণ, ২০১৬, চট্টগ্রাম।
৪. নজ্‌মে দিল কুশা-ফি-মিলাদে মোস্তফা (দ.), আল্লামা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল করিম (র), ৩য় সংস্করণ, ২০১৬, চট্টগ্রাম।
৫. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী: একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা, মো: মাহবুবুল আলম, ২০২০, চট্টগ্রাম।
৬. তোহফাতুল আখইয়ার, হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী, ২য় খণ্ড, ৩য় প্রকাশ-১৪০৭ বাংলা, চট্টগ্রাম।
৭. মাসিক আলোকধারা, জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যা।
৮. মাওলানা হাদী: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র, সম্পাদনা- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, ২০১৭, চট্টগ্রাম।
৯. রত্নবিন্দু, আল্লামা সৈয়্যদ আব্দুস্ সালাম ভূজপুরী, ২য় সংস্করণ, ২০১৩, চট্টগ্রাম।
১০. ফকির উল্লাস ও ওফাতনামা, সম্পাদনা- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, ২০১৯, চট্টগ্রাম।
১১. জুম্‌লে আম্বিয়া ও জুম্‌লে আওলিয়া, মৌলানা পীর আমিনুল হক হারবাঙ্গিরী, চট্টগ্রাম।
১২. মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র, সম্পাদনা- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, ২০১৯, চট্টগ্রাম।
১৩. রমেশ শীল: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র, সম্পাদনা- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৯, চট্টগ্রাম।

একুশ শতকে মুসলিম উম্মাহ্‌র চ্যালেঞ্জ : প্রেক্ষাপট, সমস্যা এবং সমাধান

জাবেদ বিন আলম

ক. প্রেক্ষাপট

১. বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবী দেখেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪-১৯১৯ পর্যন্ত চার বছর ব্যাপী সংঘটিত ভয়াবহ মহাসমরের বীভৎসতায় পৃথিবীর দৃশ্যপট অনেকাংশে পাল্টাতে থাকে। ১৯৩৯-১৯৪৫ সময়ে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীর মানচিত্রই বদলে দেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে নানামুখি বাঁক সৃষ্টিকারী এ দুটি যুদ্ধের উৎপত্তিস্থল ইউরোপ হলেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পৃথিবীতে। ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সমকালীন রাজাদের অহংকার, দাপট, দাম্ভিকতা, অন্তকোন্দল এবং পারস্পরিক কলহের কারণে পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছে কোটি কোটি মানব সন্তান হত্যার বর্বরতম ইতিহাস। মানুষ হত্যার জন্যে আবিষ্কার করেছে নানা রকম মারণাস্ত্র। এ সকল মারণাস্ত্র আবিষ্কার এবং যুদ্ধের প্রধান কারণ ১. এক জাতির উপর অন্য জাতির এবং এক রাজার উপর অন্য রাজা বা সম্রাটের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব ২. এক জাতি বা দেশের সম্পদ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করে ভোগবাদী জীবনধারার উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা প্রতিষ্ঠার অন্তহীন প্রতিযোগিতা। ৩. দেশ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ প্রীতিময় সহাবস্থান-নীতি-চেতনার অভাব। দুটি যুদ্ধের তাত্ত্বিক সূত্রের সঙ্গে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, অনৈতিকতার মতো মানসিক ব্যাধিগুলো জড়িত। সম্পদের লোভ এবং কর্তৃত্বের বাসনা প্রতিবন্ধী জাতিগুলোকে এতো হীন জীবে পরিণত করে যে এক পর্যায়ে ডাইনোসরের মতো এরা সমগ্র বিশ্বকে গিলে খেতে উগ্র হয়ে উঠে। এ ধরনের দুর্বৃত্ত প্রবণ মানসিকতার সরাসরি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া দু'টি বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ১৯১৭ সালে ইউরোপ-এশিয়ার বিশাল ভূখন্ড রাশিয়া জুড়ে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয় দুনিয়া কাঁপানো সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব। ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লবের পর এটি পৃথিবীর বুকে নতুন ধারার একটি আর্থ-রাজনৈতিক বিপ্লব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের বিশাল অংশজুড়ে আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব আরোপকারী তুর্কী সালতানাতি সাম্রাজ্য জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়ার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ইতালী-রাশিয়ার বিরুদ্ধে শসস্ত্র মহাসমরে অংশ নেয়। এ সময় সনাতনী রাজতান্ত্রিক কাঠামোর তুরুষ্ক 'সিকম্যান অব ইউরোপ' হিসেবে পরিহাসতুল্য শব্দমালায় উপেক্ষিত হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পরপর মূলত উসমানীয় সাম্রাজ্য তথা পৃথিবীব্যাপী এক সময়ের দোর্দন্ড প্রতাপশালী তুর্কী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। ১৯১৯ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বিজয়ী দেশগুলোর সিদ্ধান্তের আলোকে তুরস্কের সঙ্গে ১৯২০ সালে সম্পাদিত হয় 'সেভার্স সন্ধি'। এ সন্ধির শর্তানুসারে আফ্রিকা মহাদেশের রাজ্যসমূহ সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া এবং আরব ভূখন্ডের উপর তুরুস্কের রাজনৈতিক প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। এক কথায় নিজস্ব ভূখন্ড ব্যতীত গ্রীস এবং এশিয়া মাইনরের আশপাশের অঞ্চলসমূহে তুরুস্কের পতনের মধ্য দিয়ে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন ভূখন্ডে নতুন নামকরণের ভিত্তিতে মুসলিম জনঅধ্যুষিত অনেক দেশ ও রাজ্যের উত্থান ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন নতুন নামে পরিচিতি পাওয়া এ সকল রাজ্য ও ভূখন্ডসমূহ মূলতঃ যুদ্ধবিজয়ী বৃটিশ, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এদের নিয়ন্ত্রিত ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের সামন্তসূতা হিসেবে চিহ্নিত তথাকথিত উসমানীয় খিলাফতের অবসানের মধ্যদিয়ে নতুন ধারার মুসলিম জনঅধ্যুষিত ভূখন্ডসমূহ বিভক্ত ও বিন্যস্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী ইউরোপীয়রা তুরস্ক নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডসমূহ লুটের মালের মতো নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। বস্তুতপক্ষে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ভৌগলিক সীমানায় চিহ্নিত করা ভূখণ্ড গুলো এখন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত হচ্ছে।

২. ১৯৩৯-১৯৪৫ সময়ে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ অর্থনৈতিক মানবিক এবং সামাজিক বহুমুখি সমস্যায় নিমজ্জিত হয়ে পড়লে আত্মরক্ষার স্বার্থে দ্রুততর সময়ের মধ্যে উপনিবেশসমূহ ত্যাগ করে সম্পদ লুণ্ঠন ও কর্তৃত্ব অবগুণ্ঠনে বাধ্য হয়। এ সময় পৃথিবীর অনেক দেশ ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত পৃথিবীর মানচিত্রে মুসলিম জনঅধ্যুষিত স্বাধীন রাষ্ট্র এবং রাজতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা ৫২টি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোতেও মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা অগণিত। সবমিলে পৃথিবীতে ১৮০ কোটির উর্ধে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে।

৩. চলমান পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে একবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত দেশগুলো হচ্ছে: ১. সউদী আরব, ২. সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৩. ওমান, ৪. কাতার, ৫. কুয়েত, ৬. ইরাক ৭.

ইরান, ৮. বুর্কিনাফাসো, ৯. আফগানিস্তান, ১০. আলবেনিয়া, ১১. ইয়েমেন, ১২. ইন্দোনেশিয়া, ১৩. কমরু, ১৪. গাম্বিয়া, ১৫. গিনি, ১৬. গিনি বিসাউ, ১৭. ঘানা, ১৮. চাঁদ, ১৯. জিবুতি, ২০. জর্দান, ২১. তিউনিসিয়া, ২২. তুরস্ক, ২৩. নাইজার, ২৪. নাইজেরিয়া, ২৫. পাকিস্তান, ২৬. বাহরাইন, ২৭. বাংলাদেশ, ২৮. ব্রুনি (ব্রুনাই), ২৯. মালয়েশিয়া, ৩০. মালদ্বীপ, ৩১. মিশর, ৩২. মৌরিতানিয়া, ৩৩. মরক্কো, ৩৪. লিবিয়া, ৩৫. লেবানন, ৩৬. মিশর, ৩৭. সিরিয়া, ৩৮. সুদান, ৩৯. সেনেগাল, ৩০. সোমালিয়া, ৪১. আজারবাইজান, ৪২. ইরিত্রিয়া, ৪৩. কাজাখস্তান, ৪৪. কিরগিজস্তান, ৪৫. তুর্কমেনিস্তান, ৪৬. উজবেকিস্তান, ৪৭. তাজিকিস্তান, ৪৮. জিম্বাবুয়ে, ৪৯. ফিলিস্তিন, ৫০. ইথিওপিয়া, ৫১. মালী, ৫২. বসনিয়া হার্জেগোভিনা। ৫২টি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে ১. গিনি বিসাউ, ২. ঘানা. ৩. সিয়েরালিওন, ৪. খাজাখস্তান এবং ৫. ইথিওপিয়া এই ৫টি দেশে মুসলিম অধিবাসী ৫০% এর কম হলেও অন্যান্য ধর্মানুসারীর তুলনায় শতকরা হার বেশি। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে আরব ইসরাইল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বশক্তি সমূহের মনোভাব এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি দুষ্টিভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন হিসেবে মরক্কোর রাবাতায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে O.I.C বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা গঠন করা হয়। এ সংগঠন মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে সংহতি সংহত করতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম না হলেও এখনো টিকে আছে।

৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে সেভার্স সন্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ক বিশাল সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরুস্কের পরাজয় স্বাভাবিক কারণেই তুরস্কের জনগণ সনাতনী তুর্কী সুলতানের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য প্রত্যাহার করতে থাকে। তুরস্কের অরাজক পরিস্থিতিতে দুর্বল রাজতন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক এবং ক্ষমতাহীন করে দেন তরুণ তুর্কী খ্যাত আনোয়ার পাশা, তালাত পাশা এবং জামাল পাশা নামের তিন পাশা। একদিকে পরজিত সুলতানের উপর পশ্চাত্যের প্রচন্ড চাপ, অন্যদিকে তুরস্কের সর্বত্র অরাজক পরিস্থিতির কারণে বিদ্রোহের মাধ্যমে সুলতানকে অপসারণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেন মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক। জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ কামাল আতাতুর্ক সেভার্স সন্ধি চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি এশিয়া মাইনর থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করে তুরস্কের পক্ষে অনেকাংশে সুবিধাজনক 'লুইজান সন্ধি' সম্পাদন করতে যুদ্ধ বিজয়ী মিত্র শক্তিকে বাধ্য করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কামাল আতাতুর্কের এই অভিযাত্রা মুসলিম জগতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি চিন্তা কর্মে নতুন ধারার সূচনা করে। প্রথম মহাসমরে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বিশ্বশক্তি হিসেবে পরিচিত উসমানিয়া সুলতানাত তথা তুর্কী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। এর পূর্বে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের কালচক্রে এশিয়ার ভারতবর্ষ জুড়ে দীর্ঘ আটশত বৎসর সময়ের ঘোরী, খিলজী, তুঘলক মুঘল প্রভৃতি গোত্রীয় নামের মুসলিম শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হিজরতের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) মদিনা সনদ ভিত্তিক একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। একমাত্র মহান স্রষ্টার প্রতি পরমানুগত এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানবিক সাম্য, মানবাধিকার এবং বিচার সাম্যের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত উসমান গণি (রা.) হযরত আলী (রা.)'র শাহাদতের সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ ধার্মিকতার আদলে খোলাফায়ে রাশেদীন নামে পরিচালিত হয়। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলী (রা.)'র শাহাদত পরবর্তীতে হযরত ইমাম হাসান (রা.) কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস পর মুসলমানদের মধ্যে অন্তবিরোধ এবং উপর্যুপরি রক্তপাতের অবসান কল্পে স্বেচ্ছায় খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগের মধ্যদিয়ে আক্ষরিক অর্থে খোলাফায়ে রাশেদীনের অবসান ঘটে।

৫. ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার গভর্ণর আমীর মোয়াবিয়া কার্যত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম জাহানে তাঁর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রবর্তিত খিলাফতের উত্তরাধিকার নীতি পরিত্যাগ করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়কাল থেকে ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া রাজবংশের সূত্রপাত ঘটে। উমাইয়া রাজবংশ ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। উমাইয়া শাসনামলে খোলাফায়ে রাশেদীনের পরম মূল্যবোধ সমৃদ্ধ খিলাফত পরিচালনার আদর্শসমূহ পরিত্যাজ্য হয়। একমাত্র উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) ব্যতীত অন্য সকল শাসকের মধ্যে রোমান-পারসিক সম্রাটদের অনুকরণে দাম্ভিকতা প্রশ্রয় পেয়েছিল সীমাহীন। সাম্রাজ্য বিস্তার এবং প্রতিদ্বন্দীদের বিনাশ সাধনের লক্ষ্যে উমাইয়ারা বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে। উমাইয়া শাসনামলে সমুদ্র অভিযান এবং গ্রীক রোমানদের নৌবহর ঠেকানোর জন্যে সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করা হয়। আল-ওয়ালিদের রাজত্বকালে বিশাল আকৃতির সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যয় বিপুল আকার ধারণ করে। বিশাল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী দিয়ে সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার একপর্যায়ে সমাজ পরিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়মে ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাতকারী উমাইয়া রাজবংশের শেষ শাসক দ্বিতীয় মারওয়ান সিরিয়ার সন্নিকটে জাব নদীর তীরে সংঘটিত যুদ্ধে আব্বাসীয়দের নিকট পরাজিত এবং নিহত হন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত জাবে'র যুদ্ধে দামেস্ক বিজয়ের মাধ্যমে কার্যত আব্বাসীয় রাজবংশের সূত্রপাত ঘটে। আব্বাসীয় রাজবংশ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আব্বাসীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবুল আব্বাস আস্ সাফ্‌ফা। আস্-সাফ্‌ফা অর্থ রক্ত পিপাসু। উমাইয়াদের দোর্দন্ডপ্রতাপ এবং সীমাহীন নির্যাতন ও প্রতিশোধ প্রবণতায় অতিষ্ঠ জনগণ, বিশেষত কারবালার প্রান্তরে রাসূল (দ.)'র পরম প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং নবী পরিবারের পবিত্র সদস্যদের শাহাদত, পবিত্র মদিনা আক্রমণ এবং গণহত্যা সংঘটন, কাবাগৃহ আক্রমণ ও ক্ষতিসাধনের

পরিপ্রেক্ষিতে সাধারন মুসলমানের অন্তরকে সর্বদাই আগ্নেয়গিরির মতো উত্তপ্ত করে রাখে। উমাইয়া শাসনামলে আল্লাহ্‌র মোখলেস বান্দাদের বিশেষত অলি-দরবেশদের অনুতাপের দীর্ঘশ্বাস এবং অভিশাপ সবসময় উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়েছে। এক পর্যায়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র উমাইয়া বিরোধিগণ দামামার সূত্রপাত ঘটালে কোরাইশদের হাশিমী বংশের আব্বাসীয় গোত্রের আবুল আব্বাস আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল আব্বাস সিংহাসনে আরোহন করে উমাইয়াদের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন। আমীর মোয়াবিয়া এবং হযরত দ্বিতীয় উমর (রহ.) ব্যতীত সকল উমাইয়া শাসকদের সমাধিগুলো বিধ্বস্ত করে শবদেহে অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে বর্বর প্রতিশোধ গ্রহণ করায় তাঁর নামের সঙ্গে আস্ সাফ্‌ফা জুড়ে দেয়া হয়। আব্বাসীয়দের দীর্ঘ শাসনামলে বাদশাহ্ হারুন অর রশীদ এবং আল মামুনের সময় শিল্প সাহিত্য গ্রন্থানুবাদ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণিতত্ত্ব, খনিজ বিজ্ঞান, ধর্ম শাস্ত্র, স্থাপত্য শিল্প, চারুশিল্প, সুকুমার শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি এখনো বিশ্ব পরিমন্ডলে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আব্বাসীয় শাসনামলে সর্বপ্রথম কাগজের মাধ্যমে লিখন, দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যা সভ্যতা সংরক্ষণে যুগোপযোগী ভূমিকা রেখে চলেছে। পানি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে অনুর্বর এলাকায় কৃষিকাজের উন্নয়নেও আব্বাসীয়দের অবদান অনস্বীকার্য।

৬. আব্বাসীয় শাসনামলে গ্রীক মনীষী টলেমীর ভূগোল সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন ইয়াকুত ইবনে ইসহাক আল কিন্দি, সাবিত ইবনে কোরবাহ। তাঁদের অনুবাদ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে আল খাওয়ারিজমী সর্বপ্রথম পৃথিবীর ভূ-মানচিত্র অংকন করেন, যা এখনো ভূ-বিশারদরা মৌলিক মানচিত্র হিসেবে অনুশীলন করে থাকেন। পৃথিবীর স্থল এবং জলপথ আবিষ্কারের ব্যাপারে সিন্দবাদ এবং আহমদ বিন ফাজলান বিন হাম্মাদ এখনো ইতিহাসের প্রশংসনীয় নাম। ইবনে বতুতা, ইবনে রুশতাহ্, ইবনে হাওকাল প্রমুখের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং দেশ অঞ্চল, ভূ-ভাগ, জল-স্থল জুড়ে পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বর্ণনায় ফুটে উঠেছে ভূ-গোল শাস্ত্রের ব্যাপক পরিচিতি। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের পর আরবদের মধ্যে ইতিহাস রচনায় পৃথিবীখ্যাত হয়েছেন বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র জীবনীগ্রন্থ প্রণেতা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। তাঁর পরে ইবনে হিশাম, মুসা ইবনে উকবা, আল ওয়াকিদী প্রভৃতি বিখ্যাত নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইবনে কুতাইবা, হামজা আল ইস্পাহানী, তাবারী, মাসুদী, ইবনে আল আসীর প্রমুখ ইতিহাসবিদদের ধারাবাহিকতায় সমাজ বিজ্ঞান ও আধুনিক ইতিহাস শাস্ত্রের জনক ইবনে খালদুনের বিস্ময়কর অভ্যুদয় ঘটে। আব্বাসীয় শাসনামলে ইতিহাসবিদরা একেকজন যেন ইতিহাসের ইতিহাস। ইসলামী দর্শনের স্থপতি এবং মৌলিকত্ব নির্ধারণকারী হিসেবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)'র নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। এ ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইমাম জাফর সাদেক (রা.), ইমাম আল রাজী, আল গাজ্জালী (রহ.) প্রমুখ দার্শনিক ব্যক্তিত্ব ইসলামী জীবন দর্শনের বিশ্ববিখ্যাত দিকপাল। আব্বাসীয় যুগে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো অ্যারিস্টটলীয় ধারার অনুসারী হিসেবে বিশ্বখ্যাত হয়েছেন আল ফারাবী, আল কিন্দি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশ্‌দ প্রমুখ। এ সকল দার্শনিকদের বিস্ময়কর প্রতিভায় সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, চক্ষু চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে। আল ফারাবী দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে নিও প্লাটোনিস্ট এবং অ্যারিস্টটলের পর পৃথিবীবাসীর দ্বিতীয় শিক্ষক তথা মুয়াল্লিম আল সানি নামে সুপরিচিত।

৭. গ্রীক এবং ভারতীয় মূল্যবান গ্রন্থাবলী অনুবাদ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী দিগন্তের সূচনা করেন মুসলিম গবেষকরা। অনুবাদকৃত গ্রন্থসমূহ থেকে তাঁরা চিকিৎসা সম্পর্কিত অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। হুসায়েন বিন ইসহাকের চক্ষু চিকিৎসার ওপর রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ ঔষধ পত্রের বিধান যা 'ফার্মাকোফিল' নামে সমধিক পরিচিতি অর্জন করে। রসায়ন শাস্ত্রের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান, ইবনে সিনান, আর রাজী, আলী আত-তাবারী, আল আব্বাস ইবনে সিনা, আলী বিন ঈশা প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ-চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের উত্থান আব্বাসীয়দের জ্ঞান চর্চার অনন্য নজীর। আব্বাসীয় আমলে নিযাম উল মূলক রাজনীতি বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিয়াসত নামা' রচনা করেন। বাগদাদের বিখ্যাত নিযামিয়া মাদ্‌রাসা নামের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ আল বাত্তানী কিতাবুল হিন্দের রচয়িতা আল বেরুনী, সেলজুক সুলতানি আমলের ওমর খৈয়াম, নাসিরুদ্দিন তুসী এ ধরনের অসংখ্য অমর প্রতিভা আব্বাসীয় শাসকদের গবেষণাধর্মী কর্মে পৃষ্ঠপোষকতার ফসল। আব্বাসীয় বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, দর্শন, হাদীস সংকলন প্রভৃতির পাশাপশি কালজয়ী উপন্যাস 'হাজার আফ্‌সানা'; 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়ল' রচিত হয়। আব্বাসীয় আমলে মুক্তবুদ্ধি ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার যে ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল তাতে নিঃসন্দেহে বিশ্বদৃষ্টি বাগদাদের দিকে নিবিষ্ট হয়। তবে মুক্তবুদ্ধির অবাধ চর্চার নেতিবাচক প্রতিফলন ঘটে আল কোরআন সম্পর্কে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের 'মাখলুক' তথা 'সৃষ্ট' দাবীর মুখে 'আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম' হিসেবে স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার করার ফিত্‌না সৃষ্টির মাধ্যমে ভিন্নমত দমন, দলন, এবং আহলে বাইতের প্রতি অসদাচারসহ বিভিন্ন অনৈতিক ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি অসহিষ্ণুতা চরম ভোগবাদী-বস্তুবাদী জীবনাতিপাতের কারণে আব্বাসীয়দের জ্ঞান চর্চার অবদান অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়ে।

৮. আব্বাসীয়দের মধ্যে অন্তকোন্দল, গৃহযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দায়িত্বরতদের ক্ষমতা ব্যবহারের উদগ্র বাসনার লক্ষ্যে গুপ্ত হত্যা এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করার কারণে সীমান্তবর্তী হালাকু খানের সাম্রাজ্য অনিরাপদ হয়ে উঠলে মোঙ্গল বাহিনীর ষাড়াশি আক্রমণের মুখে ১৬ লক্ষ নাগরিকের

রক্ত বন্যায় আব্বাসীয় শাসনের অবসান ঘটে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আব্বাসীয়দের বাগদাদ কেন্দ্রিক মুসলিম উম্মাহ্‌র রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি জনিত ঐক্যেরও সমাপ্তি ঘটে। বাগদাদ ভিত্তিক আব্বাসীয় শাসন চলাকালে স্পেনে উমাইয়া শাসন (৭০৬-১০৩১), মিশরে শিয়াপন্থী ফাতেমী খিলাফত (৯০৯-১১৭১) এবং আইয়ুবী শাসন (১১৭৪-১২৫০) মূলতঃ উম্মাহ্‌র মধ্যে গোত্রীয়, ধর্মীয় মতবাদিক বিভক্তির নমুনা হিসেবে প্রকাশ পেতে থাকে। আব্বাসীয় শাসনামলে বাদশা হারুন অর রশীদ কর্তৃক খ্রিষ্ট ধর্মাচারীদের প্রতি রাজনৈতিক কারণে বিরূপ আচরণ, মিশরের ফাতেমী শাসক আল হাকিম কর্তৃক জেরুজালেমের গীর্জার ধ্বংস সাধন, সর্বোপরি সেলজুক শাসনামলে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রী হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগতরা পথিমধ্যে লুণ্ঠন এবং অরাজকতার সম্মুখীন হলে খ্রিষ্ট ধর্মাচারীদের বিস্তীর্ণ আবাসভূমি ইউরোপে ধর্মযুদ্ধ তথা ক্রুসেডের ঢাক-ঢোল বেজে উঠে। আব্বাসীয় শাসনামলে প্রথম পর্যায়ের ক্রুসেডের সূত্রপাত ঘটে। প্রথম ক্রুসেড ১০৯৫ থেকে ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রুসেড সংঘটিত হয় গাজী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর নেতৃত্বে। ১১৮৭ থেকে ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী এই ক্রুসেডে ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড জেরুজালেম দখলে ব্যর্থ হয়ে গাজী সালাহ্ উদ্দীনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি অনুযায়ী তীর্থ যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধান, ধর্মীয় তীর্থ স্থানের মর্যাদা সংরক্ষণের অঙ্গীকার প্রদানসহ শান্তির পথ উন্মোচন করা হয়। গাজী সালাহ্ উদ্দীনের ইন্তিকালের পর ১১৯৩ থেকে ১২৯১ পর্যন্ত ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম ক্রুসেড প্রায় শতবর্ষব্যাপী সংঘটিত হয়। ৮ম ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধ।

৯. দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেড আক্ষরিক অর্থে প্রফেসর পি.কে হিট্টির ভাষায় "মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ইউরোপের তীব্র প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ।" মূলতঃ ক্রুসেড ছিল "ধর্মীয় উত্তেজনা, ধর্মান্ধতা এবং গোঁড়ামির" পরিণতি, সর্বোপরি পাপমোচন, স্বর্গ লাভের আশায় প্রায় তিন শতাব্দী ধরে চলমান যুদ্ধে ইউরোপের খ্রিষ্ট জগৎ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তি সামর্থের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধের সময় পরস্পরের জয়-পরাজয়ের বছরসমূহে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং উন্নত জীবনাচারে অগ্রগামী প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা স্পষ্ট হয়। কুসংস্কার এবং কুপমন্ডুক জীবনাচারে অভ্যস্ত পাশ্চাত্য প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে তৎপর হয়ে ওঠে। প্রাচ্যবাসীদের জীবনোপকরণের নতুন উপাদান লক্ষ্য করে ইউরোপে শুরু হয় অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথে অভিযাত্রার ব্যাপক তৎপরতা। ঐতিহাসিক টয়েনবির ভাষায় "ক্রুসেডের ফলে আধুনিক ইউরোপ জন্ম লাভ করেছে।"

১০. প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত ক্রুসেডে জড়িত থেকে সমগ্র ইউরোপ প্রাচ্যের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রাপ্ত হয়। ক্রুসেডের পর ইউরোপ বহিঃজগতের সন্ধানে বের হবার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ইউরোপের চেয়ে বহিঃবিশ্বের সংস্কৃতি, সভ্যতা, জীবনাচারকে উন্নততর হিসেবে লক্ষ্য মাত্রায় রেখে প্রাচ্যের জীবনাচার এবং সম্পদের প্রাচুর্য যাচনায় অসংখ্য দুঃসাহসী, অর্থলোভী ব্যক্তি এবং নতুন দেশ আবিষ্কারকারীদের আকর্ষণের জগৎ হয়ে ওঠে প্রাচ্য। ত্রয়োদশ শতকে কুবলাই খাঁ'র চীন সম্পর্কে অলীক কাহিনী মার্কোপোলোর মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে এশিয়ার দিকে পাশ্চাত্য জগতের ঝোঁক বেড়ে যায়। এ সময় নৌপথের জাহাজের সঙ্গে স্থলপথের উষ্ট্রারোহী যাত্রীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। দেশ আবিষ্কারের নেশায় মত্ত কলম্বাস ভারতের কাল্পনিক অর্থ সম্পদের সন্ধানে বহির্গত হয়ে দিকভ্রান্ত ঠিকানায় পৌঁছে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণান্তে ভারত মহাসাগর হয়ে কয়েক বছর পর ভারতে উপস্থিত হয়ে উল্লেখ করেন, "তাদের প্রেরণা ধর্ম ও বাণিজ্য।" ভাস্কো দা গামা প্রকাশ্যে বলেছিলেন, "আমরা এসেছি খ্রিষ্টান এবং মশলার সন্ধানে।" এভাবে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা সূর্যোদয়ের দেশ খ্যাত জাপান আবিষ্কার করে। ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট ফ্র্যান্সিস জেভিয়ারের তদারকিতে অতিদ্রুত ডাচ, স্পেনীয় এবং বৃটিশ বাণিজ্য খোলার পথ সুগম হয়। বহিঃজগতে বের হয়ে পড়া ইউরোপ ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে এশিয়ার প্রায় সকল দেশ ও ভূখন্ডকে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অধীনে নিয়ে আসে।

১৮৭৪ সালের কাছাকাছি সময়ে স্ট্যানলি যখন কংগো নদী পথ দিয়ে আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন এবং পাশ্চাত্য জগতের জন্যে সর্বশেষ বিজিত ভূখন্ডের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তখন ইউরোপ বহির্ভূত জগতের অধিকাংশ স্থান ছ'টি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পৃথিবীর মানচিত্রে গোলাপী, নীল, সবুজ, লাল, কমলা রঙ এবং হলুদের রঙে এশিয়ার প্রায় অর্ধেক এবং প্রায় সমগ্র আফ্রিকা স্পষ্টভাবে ব্রিটেন, স্পেন, বেলজিয়াম, জার্মানী, ফ্রান্স, পর্তুগাল, এবং নেদারল্যান্ডস'র অধিকার ভুক্ত দেখানো হয়েছিল। এক কথায় ক্রুসেডের পর ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কর্তৃক ভূমধ্যসাগরের উপর পুনঃ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পেলেও তাঁর মৃত্যুর পর বিকল্পসহ সকল সমুদ্রপথ আবারো ধীরে ধীরে ইউরোপীয়দের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যায়। এভাবে মুসলমানদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসানের পাশাপাশি ইউরোপের প্রাচ্য বিজয়ের সূত্রপাত ঘটে। একই সঙ্গে ইতিহাসের ধারাপাতও পাল্টাতে থাকে অনিবার্য পন্থায়। (চলবে)

ফতুহাতে মক্কিয়া

[বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক এবং তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর (ক.) অমর গ্রন্থ 'ফতুহাতে মক্কিয়া'। তাসাওউফ সম্পর্কিত সুউচ্চমানের এ গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ আকারে প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত অনুবাদের অগ্রগতি অতি সীমিত। মহান স্রষ্টা এবং প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সর্ববিষয়ে একক এবং অবিনশ্বর আধিপত্য তথা 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' বিষয়ে হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর ধারণা সম্বলিত ফতুহাতে মক্কিয়া বাংলা ভাষায় অনুবাদ আকারে পাঠক সমীপে পেশ করার উদ্যোগ আলোকধারা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। আলোকধারা জুলাই-'২১ সংখ্যায় অনুবাদের প্রথম কিস্তি ছাপানোর মধ্য দিয়ে এই ধারাবাহিকতার সূচনা। **অনুবাদ করেছেন আবরার ইবনে সেলিম ইবনে আলী – সম্পাদক]**

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : চতুর্থ কিস্তি)

এই দরজা তাঁকে তার আকল, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি মোতাবেক রূহানী শক্তি ও হেকমত, সুক্ষ্ম স্রষ্টা শক্তি দান করে। তার জ্ঞান সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া থেকে তার নফস্‌কে মুক্তি দান করে।

কবিতা

যখন আমি আল্লাহ্‌র দরজায় নাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন আমি মোবারাকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থার সময় পার করছিলাম।
এমনকি আমার চক্ষের সামনে তাঁর অবয়ব দৃষ্টিগোচর হল, আমার সামনে তিনি ছাড়া কেউ ছিলেন না।
আমি অজুদের জ্ঞান অর্জন করে নিলাম। আমার সামনে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ছাড়া কিছু বাকী রইল না।
যদি এই দুর্বল সৃষ্টি আমার রাস্তায় চলে তবে সেই কখনো প্রশ্ন করবেনা যে এটা কেমন জিনিস?

এই কিতাবের অধ্যায় আরম্ভ করার পূর্বে আমি অধ্যায় সমূহের তালিকা করেছি তারপর আল্লাহ্‌র রহস্যজ্ঞানের সূচিপত্রের শিরোনাম বর্ণনা করেছি। তারপর তালিকা মতো প্রত্যেক অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত কথা হবে ইনশ্ আল্লাহ্। আল্লাহ্ সৎ পথ প্রদর্শনকারী।
আল্‌হামদুলিল্লাহ্ প্রথম অংশ সমাপ্ত হল। ইন্‌শ আল্লাহ্– দ্বিতীয় অংশ শুরু করলাম–আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর হাবিব (দ.)'র উপর ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইতগণের উপর দরূদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রারম্ভিকা: অনেক সময় আমার মনে এই ধারণা হত যে, এই কিতাব ঐ আক্বিদা বিশ্বাসের উপর নির্ধারণ করব, যার সমর্থনে অকাট্য দলিল এবং সুস্পষ্ট যুক্তি থাকবে। অতঃপর আমি দেখলাম এটা ঐ ব্যক্তিদের জন্য কষ্টসাধ্যের কারণ হবে, যারা "আস্‌রারে ওয়াজুদী"র (অজুদী রহস্যে'র) উচ্চ থেকে উচ্চস্তরের বিশ্বাসের সন্ধানে আসক্ত ও অকাতরে দানকারীর দরজায় উপস্থিত হন। যদি নির্জ্জনতা অন্বেষী এই আলোচনাকে আবশ্যক মনে করেন "ফিকির" (চিন্তা) হতে অবসর নিয়ে "ফকির" হয়ে বসে যান! তবে তার জন্য তার পরোয়ার দিগারের দরজায় কিছু নেই। যতক্ষণ আল্লাহ্ তায়ালা তাকে "মায়ারেফে রাব্বানী" (খোদা পরিচিতি জ্ঞান) ও "আস্‌রারে ইলাহী" (খোদার রহস্য জ্ঞান) নিজ হতে দান না করেন। যা তিনি আপন বান্দা খিজির (আ.) কে দান করেছেন। "আমার বান্দাদের থেকে এক বান্দা যাকে আমি আমার থেকে রহমত করেছি এবং "ইল্‌মে আস্‌রার" (রহস্য জ্ঞান) দান করেছি" (সূরা কাহাফ:৬৫)।
আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,
"আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন" (সূরা বাকারা:২৮)।
"যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে তোমাদের জন্য "কুয়াতে ইমতিয়ায" (স্বতন্ত্রতার জ্ঞান শক্তি) দান করা হবে" (সূরা আনফাল:২৯)।
"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এমন এক বিশেষ নূর সৃষ্টি করবেন যার আলোতে তোমরা চলবে" (সূরা হাদিদ:২৮)।
জ্ঞানের তিনটি ধাপ রয়েছে : কেউ হযরত যোনায়েদ বোগদাদী (র.) কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনি যা পেয়েছেন তা কিভাবে পেয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এই দরজায় উপনীত হতে ৩০ বছর যাবৎ বসা ছিলাম।
হযরত বায়জিদ বোস্তামী (র.) বললেন, তোমরা নিজেদের জ্ঞান মৃতদের থেকে মৃতরা শিখেছ, আর আমি নিজের জ্ঞান অর্জন করেছি তাঁর থেকে যিনি "হাইউল মাউত" (চিরঞ্জীব)। অতএব এই প্রকারের ইলম বা জ্ঞান হিম্মতের সামর্থবানরা খোদার সাথে নির্জন সম্পর্কের মাধ্যমে অর্জন করেন এবং এতে তাঁর "জালালী" অনুগ্রহ ও চরম মাহাত্ম্য নিহিত থাকে। এই জ্ঞানে প্রকাশ্যভাবে প্রবক্তার কিছু বিষয় তাঁর থেকে অদৃশ্য থাকে। বরং প্রত্যেক "সাহেবে নজর" (দৃষ্টি সম্পন্ন) এবং যুক্তিবিদের এর অবস্থা অর্জিত নয়। জ্ঞান তার "নজরে আকলী"র (দৃষ্টি দ্বারা) অর্জন হয় যখন তার তিনটি স্তর

রয়েছে।

প্রথম জ্ঞানস্তর : "ইল্‌মে আকলী" (প্রজ্ঞাভিত্তিক জ্ঞান) তোমার এই জ্ঞান তৎক্ষণাত কল্পিত অর্থাৎ কোন চিন্তা ছাড়াই অর্জন হয়। অথবা দলিলের ভিত্তিতে, যেমন অন্য কোন জিনিষের চিন্তা করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। কিন্তু তাতে অনিশ্চয়তার ভয় থাকে এবং এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইটির জন্য একত্রিত ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ জন্যই দৃশ্যতরভাবে বলা হয় এটাতে শুদ্ধও আছে আবার ভুলও আছে।

দ্বিতীয় জ্ঞানস্তর: "ইল্‌মে আহ্‌ওয়াল" (অবস্থাগত জ্ঞান) এই জ্ঞানের দিকে "আহলে জাউক" (রুচিবান ব্যক্তিবর্গ) গণের পন্থা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জ্ঞানীগণ না এর সীমা নির্ণয় করতে পারে, না এর প্রকৃত পরিচিতির উপর প্রমাণ স্থির করতে পারে। যেমন মিষ্টান্নের মিষ্টত্ব, পিত্তথলির (তিক্ত বস্তু) তিক্ততা, সকল প্রকার মজা, ইশ্‌ক, অজদ্‌ উদ্দীপনা, এ জাতীয় অন্যান্য জ্ঞান।

এই জ্ঞানের প্রকৃত অবস্থা জানা অসম্ভব। তবে তাদের জন্য ব্যতীত, যারা এর প্রকৃত মজা গ্রহণকারী। যেমন "নিম গাছের গোটা" বা "চিরতা" মজা যে একবার গ্রহণ করে, তাকে দ্বিতীয়বার দেওয়া হলে সেই এর প্রকৃত মজা বুঝে ফেলবে।

তৃতীয় জ্ঞানস্তর: "ইল্‌মে আসরারী" (রহস্য জ্ঞান) এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান যা আকল বা প্রজ্ঞানুপাতে অর্জন হয় এই জ্ঞান রুহুকে পবিত্র রুহে পরিণত করে। এটা নবী ওলীদের জন্য নির্ধারিত। এই জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার "জ্ঞান দিয়ে দৃষ্টি করা" যেমন ঐ প্রকার সমূহ হতে প্রথম ইল্‌ম বা জ্ঞান যা জ্ঞানীরা দৃষ্টি দিয়ে অর্জন করতে পারেনা বরং তাদেরকে দান করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার এতে দুই "জরব" (বর্ণনা) অন্তর্ভুক্ত, প্রথম "জরব" (বর্ণনা) দ্বিতীয় ইলমের সাথে মিলে কিন্তু এর "হাল" প্রথম "জরবের" (বর্ণনার) অনেক উর্ধ্বে এবং দ্বিতীয় "জরব" (বর্ণনা) "ইল্‌মে আখবার" (সংবাদ মূলে যে জ্ঞান)'র অন্তর্ভুক্ত। এতে সত্য ও মিথ্যা দুইটি মিশ্রিত। এমতাবস্থায় সংবাদ শ্রবণকারীর কাছে যদি সংবাদদাতা সত্যবাদী ও মর্যাদার পাত্র হয় যেভাবে "নবীগণ কর্তৃক খোদার সংবাদ বহনকারী" বা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সংবাদদাতা যেমন তারা জান্নাত ও তাতে যা কিছু আছে সব কিছুর সংবাদ দিয়ে থাকেন। তাঁরা জান্নাতের বিষয়েও তাতে যা আছে তার কথা বলা এটাই ইল্‌মে খবর। কিয়ামতের বিষয়ে বলা, যেমন সেখানে হাউজে কাউসার আছে যার পানি মধু থেকেও মিষ্ট। মূলত এটাই "ইলমে আহওয়াল" এটাই "ইলমে জওক"।

তাঁর বাণী "আল্লাহ্‌ ছিলেন তাঁর সাথে কিছুই ছিলনা" এটার উপমা পূর্বোল্লেখিত দৃষ্টি দ্বারা অর্জিত জ্ঞান"। অতএব এটি তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান যাকে "ইল্‌মে আস্‌রার" বলে। এ প্রকারের জ্ঞানীর কাছে সমস্ত জ্ঞান অর্জিত ও তিনি জ্ঞান সমুদ্রে ডুবে। তাঁদের সাথে অন্য কোন জ্ঞানীর তুলনা হয় না এবং এমন কোন জ্ঞান নাই যা তাঁদের জ্ঞান থেকে উত্তম ও সুউচ্চ হবে। তাঁদের জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের পরিবেষ্টনকারী ও আধার। কোন অদৃশ্য বস্তুর সংবাদদাতাকে শ্রবণকারীদের কাছে সত্যবাদী ও নিষ্পাপ মনে হওয়া, যখন তাঁর এ শর্ত আমাদের দৃষ্টিতে রয়েছে যে, সৃষ্টির মঙ্গল কামনাকারী এই বুদ্ধিমান জ্ঞানীগণের নফ্‌স পবিত্র। তাঁরা যদি বলে "অমুক জিনিষ আমার নিকট জায়েয" তবে এটা সত্য কি মিথ্যা যাচাই জরুরি নয় বরং তাঁর কথা আমার কাছে "জায়েয"। যেমন প্রত্যেক জ্ঞানীর জানা থাকে যে, তাঁদের কাছে এই জ্ঞান "নফ্‌সে আমর" (আত্ম উপলব্ধির) দ্বারা অর্জিত যা "গায়রে মাসুম" বা দৃশ্যতর সত্য। কিন্তু এটাতে শ্রোতাদের জন্য আবশ্যক নয় সত্য বা মিথ্যা যাচাই করা। তবে তাঁর সত্যায়নের উপর ভিত্তি করে যদি অনুসরণ করে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা তার কাছে যে সংবাদ এসেছে বা তিনি যে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন ইহাতে "আকল সমূহের" কোন কৌশল নেই বরং তাতে জায়েয হওয়া বিদ্যমান অথবা তাঁর নিকট তা পূর্ণ "ওকুফ" (বিরামতা)।

অতঃপর আসে এমন নির্দেশ যখন যা "আক্‌লান" (জ্ঞানগত) জায়েয এবং "শরিয়তান" (বিধানগত) চুপ থাকার বিষয়, তবে আমরা এই সত্য জানতাম না যে "তাকে সম্পূর্ণ রহিত করে দিয়েছে এবং আমাদের জন্য তা গ্রহণ করা না করা ইচ্ছাধীন।"

অতএব যদি প্রবক্তার অবস্থা ন্যায় পরায়ণতার দাবিদার হয় তবেও আমাদের এটা গ্রহণে ক্ষতি নেই। যেমন "তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা ও জানমাল উৎসর্গ করা" এবং যদি আমাদের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয় তবে। ইহার উপর বিবেচনা করতে হবে। যদি তাঁর সংবাদ আমাদের কাছে অন্যান্য সত্যগুলোর চাইতে সঠিক মনে হয় তবে গ্রহণ করলাম অন্যথায় বাদ দিলাম এবং তাঁদের কতকের কথার কোন বিষয়ে মন্তব্য করব না। কেননা এটা "শাহাদতে মাখতুবা" (লিখিত সাক্ষী) হয়ে যাবে। যার ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, "তাদের উক্তি অবশ্যই লিখে রাখা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে" (যুখরুফ-১৯)।

আর এ ব্যাপারে আমি (লেখক)ই "ইখলাসে নফ্‌স" (বিশ্বস্ত আত্মা)'র বেশি অধিকারী এবং যদি তা পবিত্র আত্মা হতে প্রাপ্ত বা সংগৃহীত সংবাদ ছাড়া অন্য কিছু হতো। তবে আমার কাছে সংগৃহীত তাঁর দেওয়া সংবাদসমূহ দ্বারা তাঁর মোকাবেলা করতাম। তবে আমার জন্য তাঁর দেওয়া সংবাদ সমূহের অতিরঞ্জন করা অপ্রয়োজনীয়। নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম "আস্‌রারে শরিয়ত" হতে "আস্‌রারে হিকমাতের" এমন সংবাদ সংগ্রহ করেছেন যা মানবের চিন্তা ও অর্জন শক্তির উর্ধ্বে কেবল "মোশাহেদা" ও "ইলহাম" ব্যতিত ঐ স্তরে পৌঁছার বা ঐ অবস্থা জানার কোন সুযোগ নাই। (চলবে)

'আয়নায়ে বারী' কিতাবের ভাবার্থ

● এস এম এম সেলিম উল্লাহ্ ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ৬ষ্ঠ কিস্তি)

গজল

বিচ্ছেদ ও মিলনের এটাই যে হয় মাত্র কারণ,
নিজের মুখ চন্দ্রিকাতে, নিজেই নিজের মুখ আবরণ।
নৈকট্যেরই শেষ প্রান্তে, তবু যে দূরত্বের কারণ,
নয়ন বানে দৃষ্টিগুলো আবেষ্টন, তাই না পায় দর্শন।
দৃষ্টিহীনের দৃষ্টিরূপে আছ তুমি প্রকাশমান
দ্বিতীয় আর নেই যে কিছু তোমা হতে দেখাবে ভিন।
চক্ষুগুলোর অস্তিত্ব এই, নিজেই নিজ অন্ধত্বের কারণ,
নইলে তো নিজ মুখজ্যোতি নিজ হতে হত বিচ্ছুরণ।
পুষ্পের সোহবতে থাকলে, উপসম হয় দ্বীলের যাতন,
অন্যথায় চিরকালই বসন্তে ভরত না কারণ
"ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখা" অজুদের ঐ রীতি এমন,
অন্ধকার আর আলোর মাঝে ৭০ হাজার পর্দা যেমন।
নিত্য নব শানে মানে সদা ঘটে রূপ আগমন,
মুহূর্তে রূপ বদলায় যখন যেমন হয় প্রয়োজন।
মনোহারীর এমন শানে বিভুর হয়ে প্রাণ মন,
প্রেমাস্পদের প্রেম-মুধ করে সবে আস্বাদন।
হে মকবুল! কলমে তব মুক্তা হলেও বিচ্ছুরণ,
মূল্যবান ঐ মুক্তার ক্রেতা হয় না কবু মুর্খজন,
শাহী প্রেমভাণ্ড হতে কিঞ্চিত যে করে পান,
শ্রী চরণে শান্ত মনে সদা পদানত র'ন।
"এক দেখিতে দুই দেখে (ট্যারা)",
যার চোখের হাল হয় এমন,
দিদারের সৌভাগ্য ছেড়ে ঘুরে মরে অনুক্ষণ।
নেত্র হতে ময়লা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নয়ন,
মাইজভাণ্ডারীর ধুলা বালির সুরমা লাগাও দু'নয়ন,
গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৃষ্টি কুলের জান-প্রাণ,
তাঁর রাঙ্গা পদে কর মন প্রাণ বিসর্জন।

অতএব যে মাহবুব (প্রেমাস্পদ) এ গুণ সম্পন্ন হবেন অর্থাৎ, "মজহাবে হুসন" বা রূপ বিকাশস্থলের "ফরদে আকমল" বা একক সত্তা সাব্যস্ত হবেন। তার উপর "দরজায়ে মাহবুবিয়াত" বা প্রেমাস্পদের সমাপ্তি ঘটবে। এবং তিনি "খাতেমুল মাহবুবিন" হবেন। এবং জগতের সমস্ত মাহবুবিনগণ তাঁর স্তরের তুলনায় "মকামে মুহিব্বিয়াব" বা প্রেমিকের স্তরে হবে ও তারই প্রেম বিকাশস্থল হয়ে যাবেন।

পংক্তি

প্রেমাস্পদের শর্ত যত তোমাতেই সমাপ্ত হল,
যত আছে প্রেমাস্পদ তোমাতেই সবে বেহুঁশ হল
খোদার রাজ্যে প্রেমাস্পদের যতই দাবিদার আজি
ওহে মম প্রিয়, সবাই তব পদে নত রইল।

ইহা সুস্পষ্ট যে, যে মাহবুবগণ নিজ মাহবুবিয়াতে শক্তিশালী হন, তাঁর চিত্তমগ্নতা ও কমনীয়তা বৃহৎ হয়। তো অবশ্যই তাঁর আশেক প্রেমিকগণের বিচ্ছেদ বেদনা, বিরহ-যাতনাও অত্যধিক হয়ে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে নবী পাক (দ.) ইরশাদ করেন, "ইন্না মা'য়াশারিল আম্বিয়ায়ে আসাদ্দুন্ নাসি বালায়া" অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আম্বিয়াগণ বালা মুসিবতের দিক থেকে শক্ত মানুষ" ঐ দিকেই ইঙ্গিত করে। এই রহস্যের ভিত্তির উপর খোদাবন্দে রাব্বুল আলামীন আপন মাহবুবে পাক সাহেবে তাজে লাউলাক (দ.) কে "ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মীল কুমিল লাইল, " অর্থাৎ, "হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরন করুন" সম্ভাষণে ইরশাদ করেছেন যে, হে মাহবুবে আকমল" হে "মায়াশুকে মুকাম্মেল" আপনার সৌন্দর্যময় নূরানী চেহারা হতে "আজমতে মাহবুবিয়তের (প্রেমাস্পদত্বের মহানত্ব) কম্বল উঠিয়ে দিন প্রেমচ্ছলনাময়ী ইজ্জতের পর্দা এবং প্রেমাস্পদত্ব সম্পাদনময় মনোহরী "নেকাব"কে নিজ দীপ্তময় জগৎ উজ্জ্বলকারী সূর্য রূপ জ্যোতিষ্ময় মুখমন্ডল হতে অপসারণ করুন। বিরহীর অমাবস্যা রজনী সম প্রেমোদ্যানকে জ্যোতিষ্ময় মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে আলোকিত দিবসে পরিণত করুন। আর এটাই প্রকাশমান যে, যে প্রেমিকের দুঃখ বেদনা বিরহ যাতনা যত বেশি, প্রেমাস্পদের সাথে তাঁর নৈকট্যতা ও ঘনিষ্ঠতা তত নিবিড়।

রাসূল (দ.)'র হাদিস শরীফ "ওলামাউ উম্মতি কা আম্মীয়ায়ে বনী ইস্রাইল" অর্থাৎ "আমার উম্মতের আলেম (জ্ঞানী)গণ বনী ইসরাইলের নবীগণের মত" ঐ দিকেই ইঙ্গিত।

গজল

তুমি মনোহারীর আকার মনোহারী আর কেহ না,
মানবও না পরীও না আসমানের ঐ সূর্যও না।
ভবালয়ের চতুর্প্রান্তে, খুঁজিয়ে ফিরেছি কত,
কোন রূপসীনি তব অনুরূপ না, মনোহরও না।
নানা রঙ্গিভঙ্গি কিবা, নিজ প্রেমের ছলাকলায়,
নিজেই তুমি নিজ উপমা, "দ্বিতীয়" তোমার কেহ না।
তোমারই ঐ রূপ দ্যুতি, খোদা তায়ালার দ্যুতি বটে,
তুমি খোদা থেকে জুদা নহে, যদিও তুমি খোদা না।
এমন কে বা আছে যে, নয় (তব) প্রেমতীরে পরাভূত
এমন কোন অন্তর নাই যা, তোমাতে সদা ফেদা না।
আপনা মনোহারীত্বে প্রিয়সীদের সুলতান তুমি,
এমন কোন্ প্রিয়সী সে, যে তব দ্বারের ভিখারী না।
মকবুল ঐ প্রিয়সীর কদমে হয়েছে ফানা,
খোদার গাউস হন তিনি, যদিও বা খোদ্ খোদা না।

সম্মানিত পাঠকগণ,

সৃষ্টির সূচনা কাল থেকে পবিত্র নূরে মোহাম্মদী (দ.) পবিত্র হাকিকতে আহমদী (দ.) প্রত্যেক দাওরাহ বা যুগবৃত্তে বিভিন্ন

রঙ বেরঙের লেবাসে ও আত্মা থেকে আত্মায় স্থানান্তরিত হচ্ছেন এবং নিজ প্রেমাস্পদের এক অদ্ভুতকর্মা রূপে শান মাহাত্ম্য দেখিয়ে চলেছেন। অতএব, বর্ণিত আছে যে, ৭০ হাজার বছর যাবত ঐ নূর "শাজরাতুল একিন্" বা একিন্ বৃক্ষে সাদা মুক্তার আবরণে ময়ূর রূপে দীপ্তিমান ছিলেন এবং এক লক্ষ বছর পর্যন্ত "ইয়াকুতে ছুরখী" (পদ্মরাগ মণি)'র কন্দিলের (ফানুস) মধ্যে তাসবিহ-তা'লীমে নিমগ্ন ছিলেন। একই ভাবে ঐ নূরে মুকাদ্দাস্ অনেক পর্দাবরণে বিকশিত হন এবং একেক পর্দার আড়ালে আপন মাহবুবিয়তের একেক অতুলনীয় আশ্চর্য রঙ্গ প্রদর্শন করেন। অতঃপর হযরত আদম আলা নবিয়্যীনা ওয়া আলাইহিস্সালাতু ওয়াস সাল্লামের দেহ আবরণের বাহানায় খোদ নিজেই মাসজুদে মালাইকা " [ফেরেশ্তাদের সেজদা গ্রহণকারী] হলেন। অতঃপর "রওজায়ে রিদোয়ান" [ফেরেশ্তাদের বাগান তথা স্বর্গ] থেকে "দারুল খেলাফাত" [প্রতিনিধির জগৎ] বা দুনিয়াতে তাশ্রিফ এনে এ কর্মময় জগতের পরিচালনা করেন। এবং হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালামের অবয়বে থেকে নয়শত বছর যাবৎ কাফেরদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। ও জগৎবাসী কে নিরাপদ জ্যুদি পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তারপর খলিলিয়তের (অন্তরঙ্গ বন্ধু) নিকাবে বা পর্দায় আত্মগোপন হয়ে নমরুদি বাদশাহিকে ধ্বংস করেছেন ও নমরুদী অগ্নিকুণ্ডকে নিরাপদ স্বচ্ছন্দময় প্রশান্তিবাগে পরিণত করেন। এমনিভাবে ওই ফয়েজ বিতরনকারী দেদিপ্যমান "নূর" হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত ঈশা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত রিসালাতের ঘোমটা আবৃত হয়ে পয়গম্বরি দেখাতে থাকেন এবং প্রেমাস্পদগণকে প্রশান্তি দিয়ে আসতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত স্থানান্তরের ধারাবাহিকতায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল মোতালেব (রা.) পর্যন্ত ছলনার পর্দাবৃত অবস্থায় বিরাজমান হন। তারপর হযরত আমেনা জাহরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার পবিত্র গর্ভাশয়ে নির্বিঘ্নে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে এ ভবরাজ্যে প্রাচুর্য্যতার সাথে শুভাগমন করেন এবং আপন মাহবুবিয়ানা চিত্তাকর্শী প্রেম উদ্রেক ভাবভঙ্গি দেখিয়ে যেমন নিজ নয়নবানে বাক্যবাণে বা অসির চমকে কুফরীর অন্ধকারকে জগৎসীমা হতে চিরতরে বিদূরিত করে দেন। মোহরে নবুয়তকে নিজেরই পবিত্র নামের উপর পরিসমাপ্তি করেন। বন্ধুরা! এটা মনে করবেন না যে, ঐ ফয়জ খণিময় নুর স্থানান্তরের পূর্ববৎ ধারাবাহিকতা এখন স্থগিত হয়ে গেছে এবং ঐ চিত্তাকর্ষীতা ও প্রেমাস্পদত্বতার এখন সমাপ্তি ঘটেছে। নয়, নয় কখনোই এমন হতেই পারে না। এটা কেমন করে হতে পারে, মূলত সৃষ্টির মূলাধার ঐ নূরে পাক "রূহে আলম" বা জগতের প্রাণ ও "হায়াতে আলম" জগতের আয়ুষ্কাল। ঐ রহস্যঘেরা প্রাচুর্য্যময় নূরই জগতের সঞ্জীবন ও ঐ ফয়জ বিতরনকারী দেদিপ্যমান নূরই "উমুরে আলম" বা জগতের সকল কর্মকান্ডের "মুন্তাজিম" [কার্য নির্বাহক]। বরং "এনকেলাবে এদওয়ায়" ও "এখতেলাফে লায়ল ও নাহার" তথা যুগের আবর্তন বিবর্তন ও দিবারাত্রির ঘূর্ণনে ঐ নুরের স্থানান্তরিতার রীতিনীতিতে অবশ্যই পার্থক্যতা আসে। অর্থাৎ, খতমে নুবয়তের পূর্বে ঐ খোদায়ী নুরে পাক নবুয়ত ও রিসালতের পর্দাবৃতাবস্থায় বিকাশমান ছিল। খত্মে নুবয়তের পরবর্তী জামানায় প্রত্যেক যুগে যুগে "বেলায়তে ওজমা"র ঘোমটায় আত্মগোপন হয়ে প্রেমাস্পদগণকে অলৌকিকত্ব ও চিত্তাকর্ষণ করে চলেছেন নিজের প্রেমাস্পদত্বে নিজেই "সালতানাতে মাহবুবীয়ত" (প্রেমাস্পদত্বেও রাজ্য)কে শোভিত করেছেন ও নিজের মায়াশুকিয়তের বাগানকে নিজেরই দীপ্তিময় আত্ম প্রদর্শনী দ্বারা সজ্জিত করেছেন এবং আপন দুবর্ল, হত দরিদ্র সহায় সম্বলহীন দুরাবস্থাগ্রস্ত উম্মতগণের সহায় সাহায্যের জিম্মাদার হরে আছেন।

কালে কালে নিজেই একা হন নি কভু প্রকাশিত,
প্রতিযুগে প্রতি কালে মুহাম্মদ (দ:) ছিলেন বিরাজিত।

হ্যাঁ! তবে এ নূর শরীফের স্থানান্তরিতার ও আত্মবিকাশের পদ্ধতিতে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। যে কারণে আম্বিয়ায়ে ইজাম (আ.)'গণের মর্যাদার স্তরের মধ্যে বেশি কমির স্বাতন্ত্রতা মাঝখানে এসে গেছে। অতপর এ নুর শরীফ "আলমে মেছাল" বা দৃষ্টান্ত ভূবনে কখনো সূর্যরূপে চমকায়, কখনো চন্দ্ররূপে জ্যোতিষ্মান হয় ও কখনো তারকা রূপে দৃষ্টি গোচর হয়। আর কখনো "ছেরাজ" বা প্রদীপ আকারে দেখা দেয়। যেমন আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু ইরশাদ করেন "আল্লাহু নুরুছ্ছহামা ওয়াতি ওয়াল আরদি মাছালু নুরিহী, কামিশকাতিন ফীহা মিসবাহুন, আল মিসবাহু ফী ঝুজাজাতিন, আঝ্ঝুজাজাতু কাআন্নাহা কাওকাবুন দুররিই'ইউন। অর্থাৎ আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভুমন্ডলের জ্যোতি তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি স্ফুলিঙ্গ,

যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচ পাত্রে স্থাপিত,
কাঁচ পাত্রটি সুউজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য, সূরা নুর-৩৫"

ওহে ভ্রাতা! যখন আপনার এটা পরিজ্ঞাত হল, এবার মনকর্ণ লাগিয়ে শ্রবণ করুন, ওলামায়ে কেরামের এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, যদি রশ্মী "বিজ্ঞাতী" বা সওাগত হয় তবে এটাকে "যিয়াউন" বা কিরণ দীপ্তি বলে। যদি "বিল আরেজ" বা অন্যের উপর স্থিত হয় তখন তাকে "নূর" বা আলো বলে। রাব্বুল আলামীন কোরআনে পাকের সূরা ইউনুস শরীফে এরশাদ করেছেন "হুওয়াল্লাজী জা আলাশ শামছা যিমাওঁ ওয়াল কামারা নূরাওঁ" অর্থ: তিনি সুমহান সত্ত্বা (আল্লাহ্) যিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন। আয়াত: ৫" অর্থাৎ, তিনিই হন খোদাবন্দে করিম যিনি নিজ কুদরতে কামেলা হতে সূর্যকে কিরণদার ও চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন। অতপর সূর্য সত্তাগতভাবে আলোকময় ও অন্যকেও আলোকিত করে। আর চন্দ্র যদিওবা অন্যকে আলোকিত করে তবে নিজে সওগাতভাবে আলোকময় নয় বরং সূর্য থেকে আলো নিয়ে থাকে।

"চাঁদের রশ্মি সূর্য থেকেই অর্জিত"
চন্দ্র হয় আলোকময় সূর্য দেয় কিরণ,
সূরা ইউনুছে আছে দেখ তার বর্ণন।

(চলবে)

ফকিহ্ : চার মাযহাব ইমামদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সৈয়দ আবু আহমদ

১. ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)

নোমান বিন ছাবিত ইবনে যুতা বা নোমান ইবনে মারযুবান ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রের একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ও হিজরী প্রথম শতাব্দীর একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী ফিকহের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত চারটি মাযহাবের অন্যতম একটি "হানাফী মাযহাব" এর প্রধান ইমাম হলেন হযরত নোমান বিন ছাবিত তথা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)।

জন্ম ও পরিচিতি: অধিকাংশের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ৪ শাবান ৮০ হিজরীতে ইরাকের কুফা শহরে উমাইয়া শাসনামলে পিতা ছাবিত বিন যুতা বা নোমান বিন মারযুবান এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

নাম: নোমান ইবনে সাবিত ইবনে যুতা বা নোমান ইবনে মারযুবান, উপনাম– আবু হানিফা। তবে তিনি নোমান নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নোমান হচ্ছেন তাঁর দাদা। ইমাম আযম নামেই তিনি সর্বত্র সম্বোধিত, প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত।

ইমাম আযমের পিতা ছাবিত ইবনে যুতা বা নোমান ইবনে মারযুবান ছিলেন ইরান ও পারস্যের অধিবাসী। তাঁর পিতা ছাবিত এর পিতা যুতা বা নোমান ছিলেন আহলে বাইতে রাসূল (দ.), বেলায়তের সম্রাট, খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা হযরত ইমাম আলী (রা.) এর খেদমতগার। ছেলে ছাবিতের জন্মের পর একদিন তিনি ইমাম আলী'র দরবারে হাজির হয়ে দোয়া লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এই দোয়ার বদৌলতে ইমাম আযম আবু হানিফা'র মতো দুর্লভ প্রতিভা এবং সুউচ্চ নৈতিকমানের ফকিহ্র আবির্ভাব ঘটেছে বলে তাঁর জীবনীকারদের বিশ্বাস। শুধু তা নয় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ)ও ইমাম আযম হযরত আবু হানিফার আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাবয়িজুস্ সহিফা ও তারিখে বাগদাদ কিতাবে উল্লেখ আছে।

শিক্ষা: পিতা ছাবিত এর ইনতিকালের পর ১৬ বছর বয়স থেকে ইমাম আযমকে পিতৃ ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে হয়। অতি অল্প সময়ে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর ব্যবসা বসরা, ইরান, সিরিয়া ও আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইমাম আবু হানিফা নিয়মিত বসরায় আসা যাওয়ার পথে হযরত ইমাম শাবী (রহ.) নজরে করমে পতিত হন। একদিন ইমাম শাবী (রহ.) ইমাম আযম আবু হানিফাকে ডেকে আল কোরআন-হাদিস ভিত্তিক ইলম গ্রহণের তাগিদ দেন। হযরত ইমাম শাবী (রহ.)'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইমাম আযম আবু হানিফা উৎসাহিত হয়ে ইল্ম-শিক্ষা গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) প্রথমে কুফা শহরেই ইল্মে আদব ও ইল্মে কালাম শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে তাফসীরশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর তিনি ইলমে ফিক্হর তালিম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমকালীন ফকিহ্ ইমাম হাম্মাদ (রা.) এর শিক্ষাগারে গমন করেন। এখানে তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপর সর্বোত্তম তালিম প্রাপ্ত হন। হযরত ইমাম হাম্মাদ ছাড়াও ইমাম আযম আবু হানিফার আরো অনেক উস্তাদ ছিলেন। উসূল ও উসূলে ফিকাহ্য় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর ইমাম আবু হানিফা হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বসরা ও সিরিয়ায় গমন করেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) যাঁদের থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন–

ক. ইমাম হাম্মাদ (রা.), **খ.** আমির ইবনে শুরাহবীল (রহ.) **গ.** আলকমা ইবনে মারসাদ (রহ), **ঘ.** সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.), **ঙ.** হামাক ইবনে কুতাইবা (রহ.) প্রমুখের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ।

২. হাদীস শিক্ষা লাভ: হাদীস শিক্ষার জন্য তিনি তৎকালীন বসরার হাদীস বেত্তাদের খিদমতে হাজির হন। হযরত কাতাদাহ্ (রা.)'র খিদমতে হাজির হয়ে হাদীসে দরস হাসিল করেন। এরপর হযরত শুবা (রা.)'র দরসে যোগদান করেন। হযরত শুবা (রা.) কে হাদীস শাস্ত্রে আমিরুল মুমিনিন বলা হয়। কুফা ও বসরার পর ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হারামাঈন শরিফাঈন এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। মক্কায় তিনি হযরত আতা ইবনে আবু রিবাহ (রা.)'র দরসে শামিল হয়ে হাদীস শিক্ষা হাসিল করেন।

৩. সাহাবীদের দর্শন: ইজমা উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন একজন তাবেঈ।

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (রহ) বলেন– ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)'র সাথে অসংখ্য পূণ্যবান সাহাবীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

ক. হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) **খ.** হযরত আব্দুল্লাহ আবি আওফা (রা.) **গ.** হযরত সাহল ইবনে সাআদ (রা.) **ঘ.** হযরত আবু তোফায়েল (রা) **ঙ.** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইদি (রা.) **চ.** হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) **ছ.** হযরত ওয়াসেলা ইবনুল আসকা (রা.)।

হযরত ইমাম আযমের প্রতিভা সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ বলেন– ইমাম আযম আবু হানিফা'র চেয়ে অধিক জ্ঞানী আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। সহীহ্ হাদীস সম্পর্কে তিনি আমার চেয়ে

অধিক দুরদর্শী এবং অগ্রগামী ছিলেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোতে সত্তর হাজারেরও উর্দ্ধে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর 'আল আসার' কিতাব লিখেছেন চল্লিশ হাজার হাদীস বাছাই করে। আল জাওয়াহিরুল মযিয়াহ ২য় খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

৪. ফিকহ শাস্ত্রের প্রবাদ প্রতিম মহাপুরুষ:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইসলামী আইন সংকলন ও সম্পাদনার জন্য ৪০ জন ফকিহ্ নিয়ে আইনজ্ঞ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগে যে সব মাস্য়ালা মাসায়িল সংকলন হয়েছিল তার সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ ৭০ হাজার।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– ফিকহ শাস্ত্রের সকল সুনিপুন ব্যক্তিত্বই ছিলেন ইমাম আবু হানিফার ঘরানাভুক্ত। আছারুল ফিকহিল ইসলামী কিতাবে তা উল্লেখ আছে।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন– ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এমন ব্যক্তি, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, এই স্তম্ভটিকে সোনা প্রমাণিত করবেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি তা করতে সক্ষম ছিলেন। অর্থাৎ যেকোন বিষয় সম্পর্কে তাঁর যুক্তি এবং বস্তুনিষ্ঠ ধারণা ছিল অত্যন্ত শাণিত। জামিউ বয়ানিল ইল্ম গ্রন্থে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

অবদান: ১২০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদ (রা.) এর ইন্তিকালের পর তিনি স্বীয় ওস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং যথারীতি পাঠদান ও ফতোয়া প্রদানের কাজ করতে থাকেন। দূর দূরান্ত থেকে অনেক শিক্ষার্থী তাঁর কাছে ফিকহ এর শিক্ষা অর্জনের জন্য আসতে থাকেন। তন্মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম যুফার (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) অন্যতম ছিলেন।

৫. তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ ২০টি কিতাবের নাম নিম্নে প্রদান করা হল-

১. আল ফিকহুল আকবর, ২. আল ফিকহুল আবসাত, ৩. কিতাব আল আলিম ওয়াল মুতাল্লিম, ৪. আল অসিয়া, ৫. আর রিসালা, ৬. মুসনাদে আবি হানিফা, ৭. অসিয়া ইলা ইবনিহি হাম্মাদ, ৮. অসিয়া ইলা তিলমিজিহি ইউসুফ ইবনে খালিদ, ৯. অসিয়া ইলা তিলমিজিহি আল কাজী আবি ইউসুফ, ১০. রিসালা ইলা উসমান আল বাত্তি, ১১. আল কাসিদা আল কাফিয়া (আন্ নুমানিয়া), ১২. মুজাদালা লি আহদিদ দা রিন, ১৩. মারিফাতুল মাজাহিব ১৪. আল জাওয়াবিত আল সালাসা, ১৫. রিসালা ফিল ফারাইয, ১৬. মুখতাবাতু আবি হানিফা মাআ জাফর ইবনে মুহাম্মদ, ১৭. বাআজ ফতোয়া আবি হানিফা, ১৮. কিতাবের মাকসুদ ফিস সারফ, ১৯. কিতাবু মাখারিজ ফিল হিয়াল।

৬. ইন্তিকাল: ৭৬৩ খ্রি. আব্বাসীয় বংশের আল মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে রাজ্যে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বাদশাহী শাসন বিভাগের কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব তিনি সুকৌশলে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য তাঁর পরিবর্তে তাঁরই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ আল মনসুরকে ব্যাখ্যা দিয়ে জ্ঞাত করেন যে, ইমাম আবু হানিফা নিজেকে এই পদের জন্য উপযুক্ত মনে করছেন না। আল মনসুরের এই পদে প্রস্তাব দেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল, ইমাম আবু হানিফা বিনম্র ভাষায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরও মনসুর তাঁকে 'মিথ্যাবাদী' হিসেবে অভিযুক্ত করেন। এ ধরনের অভিযোগের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানিফা বাদশাহ মনসুরকে বলেন 'আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আমার মতামত সঠিক, কারণ কিভাবে আপনি প্রধান বিচারপতির পদে একজন মিথ্যাবাদীকে বসাবেন?'

এই ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়ায় আল মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন ও তাঁকে নির্যাতন করে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। এমনকি সাক্ষাৎ প্রার্থীদের বিষয়ে বাদশাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী বিচারকরা সিদ্ধান্ত নিতেন কে কে তাঁর সাথে দেখা করতে পরবেন। অবশেষে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) ১৫ রজব ১৫০ হিজরীতে বাগদাদ শহরের কারাগারেই বন্দী অবস্থায় দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পাড়ি জমান।

৭. শেষ কথা: উম্মাহ্র রাহবার, জ্ঞানের দিকপাল, মুখলিস আবেদ, দ্বীনের খিদমতের নিরলস সাধক, আলোকিত এ জ্ঞানতাপস সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন–

যে ব্যক্তি ফিকহ্'র জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে যেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর ছাত্রদের সান্নিধ্য লাভ করেন। কারণ ফিকহ্'র ব্যাপারে সকলেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)'র মুখাপেক্ষি।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন– ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কেবলমাত্র কারাগারে বন্দী অবস্থায় ১২ লক্ষ ৯০ হাজার মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করেন।

সর্বশেষে বলা যায় তিনি আহলে বাইতে রাসুল (দ.) এর আওলাদ হযরত ইমাম বাকের (রা.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং পরবর্তীতে হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রা.) এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়। হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রা.)'র সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার ভাল সম্পর্ক ছিল। এক কথায় তিনি আওলাদে রাসূলের অন্যতম অনুগামী এবং তাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন।

(চলবে)

হে অতীত কথা কও

[আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া। বেসুমার দরুদ ও সালাম বিশ্বনবী (দ.)'র প্রতি। সালাম গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সহ সকল আউলিয়া কিরামের প্রতি।

আমাদের সহৃদয় পাঠক সমীপে শুভ বার্তা হচ্ছে আলোকধারা ইতোমধ্যে সিকি শতাব্দী অতিক্রম করে ২৮তম বর্ষে পদার্পন করেছে। সময়টি খুব একটা কম নয়। এ সময়ের মধ্যে অনেক প্রথিতযশা লেখকের কলমের কালির আঁচরে আলোকধারা অর্জন করেছে অনেক সমৃদ্ধি এবং প্রসিদ্ধি। প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত লেখকদের অনেকেই আল্লাহ্‌র অপার ইচ্ছায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তারা এখন আমাদের দৃষ্টির আড়ালে কিন্তু স্মৃতির আড়ালে নয়। তাঁদের অবস্থান আমাদের অন্তরালে জাগরুক আছে। তাঁদেরকে নিয়েই আমাদের অতীত। তাঁরাই আলোকধারার ঐতিহ্য এবং চিন্তা চেতনার নির্মাতা। আমরা তাঁদেরকে স্মরণ রাখতে চাই। তাদের স্মরণ করার মধ্যেই রয়েছে আলোকধারার আত্মিক জাগৃতি। তাঁদের লিখা সমূহ পুনঃমুদ্রণের মাধ্যমে তাঁদেরকে আমরা চর্চায় রাখতে চাই। আমরা তাঁদেরকে ভুলব কি করে? তাঁরাই একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও পর্যাপ্ত আন্তরিকতা নিয়ে আলোকধারা প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁরা আলোকধারার স্মৃতিতে অম্লান। আলোকধারা কর্তৃপক্ষ তৎসময়ে ছাপানো তাঁদের লিখাসমূহ পুনঃমুদ্রণ করে সমৃদ্ধ অতীতকে পাঠক সমীপে উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। স্মৃতিতে যাঁরা অম্লান তাঁদের মধ্য হতে এ সংখ্যায় মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অন্যতম খাদেম, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ সিকদার, কবি সুলেখক শওকত হাফিজ খান রুশ্নি এবং সৈয়দ আমিরুল ইসলাম মাইজভাণ্ডারী'র (বিসিএস) সংক্ষিপ্ত পরিচিত সহ তিনটি লিখা বর্তমান সময়ের পাঠকদের চর্চার সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।] – সম্পাদক

মাইজভাণ্ডারী আদর্শ : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জামাল আহমদ সিকদার

জনাব জামাল আহমদ সিকদার। মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে সুপরিচিত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একজন সাধক, গবেষক এবং সংগঠক। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাংগঠনিক ধারার অন্যতম উদ্যোক্তা। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদের আমৃত্যু সাধারণ সম্পাদক। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের প্রকাশনা বিভাগের সদাকর্মতৎপর ব্যক্তিত্ব। মন্‌জিলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত জ্যোতিধারা'র সম্পাদক। মাইজভাণ্ডারী তাসাওউফ সাহিত্যের বহুল পরিচিত মাসিক জার্নাল 'আলোকধারা'র প্রথম সম্পাদক। মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে ব্যাপক সাংগঠনিক এবং আদর্শিক সম্পৃক্ততা ছাড়াও তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। মাইজভাণ্ডারী তাসাওউফ সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান জীবনীগ্রন্থ "শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)"। এছাড়াও আলোকধারাসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তিনি অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে তাসাওউফ সাহিত্যকে জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রেখেছেন। আলোকধারা কর্তৃপক্ষ পরম শ্রদ্ধায় তাঁর অবদানকে স্মরণ রাখতে বদ্ধপরিকর। মাসিক আলোকধারায় তাঁর অসংখ্য লিখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্মরণে এবং স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশার্থে আমরা এবার "মাইজভাণ্ডারী আদর্শ : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি" গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করলাম।] –সম্পাদক।

নূর নবীর নূরের ধারা হেথা নয় অন্য কোথা

নূর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান বংশজ্যোতি আলেম, পীর ও হেদায়েতকারীরা উন্নত জীবন বিধান ইসলামের শান্তি ও মুক্তির বাণী বহন করে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েন। পাঠান ও মুঘল যুগে ভারত শাসকদের আমন্ত্রণে দিল্লীসহ ভারতের বিভিন্ন শহর ও জনপদে তাঁদের বহুল পদার্পন ঘটে। ধর্মশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা, মসজিদের ইমামতি ও বিচার কাজে কাজীর পদে নিয়োজিত হতেন। তাঁদের এক শাখা তৎকালীন নবাবের আমন্ত্রণে বাংলার রাজধানী গৌড় নগরে আসেন। এই শাখার এক কৃতি সন্তান সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড় নগরে কাজীর প্রদ অলংকৃত করেন। ১৫৭৫

খৃষ্টাব্দের মহামারীর আকালে তিনি গৌড় নগর ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ অনেক গ্রাম-গঞ্জ ঘুরে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার (বর্তমানে চন্দনাইশ) কাঞ্চননগরের ফইল্যাতলীতে এসে তথায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে সেখানে 'হাইদগাঁও' নামে একটি গ্রাম আছে। তাঁর একমাত্র পুত্র সৈয়দ আব্দুল কাদের মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব নিয়ে ফটিকছড়ি থানায় আজিম নগরে বাড়ী করেন। তাঁর প্রপৌত্র মৌলবী সৈয়দ মতিউল্লাহ মাইজভাণ্ডার গ্রামে হিজরত করেন।[১]

বিজয়ের বীজাগার, পবিত্র মাইজভাণ্ডার

বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় অঞ্চল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুণ্ঠনে বিরান হবার উপক্রম হলে সুবে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁর নির্দেশে পূর্ববর্তী সুবেদার ইসলাম খাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে ১৬৬৬ খৃঃ এক বিরাট বাহিনী প্রেরিত হয়। উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যস্থলে নির্মিত হয় সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদ ভাণ্ডার। মুঘল বাহিনী জলদস্যুদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে সমগ্র অঞ্চলে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয় গর্বিত সেনাপতি স্বীয় পিতা ইসলাম খাঁর নামে চট্টগ্রামের নাম পাল্টিয়ে রাখেন ইসলামাবাদ। পরবর্তীকালে অস্ত্র ও রসদ রাখার মধ্য ভাণ্ডার হতে গ্রামের নাম হয় মাইজভাণ্ডার। চট্টগ্রাম মহানগরী হতে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে এর অবস্থান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এখানে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্ব মানবতার অন্যতম মুক্তিদূত হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) (১৮২৬-১৯০৬)। তিনি মৌলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ্‌র সুযোগ্য পুত্র। হযরত মহীউদ্দীন ইবনুল আরবীর ৫৮৬ বৎসর পূর্বের ভবিষ্যতবাণীর আহমদ ও আল্লাহ্ শব্দ যুক্ত নামের অধিকারী আহমদ উল্লাহ।[২]

নবী অলীর শত ধারা, ভাণ্ডারে দিয়েছে ধরা

গ্রাম্য মকতবে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১২৬৮ হিজরীতে মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১২৬৯ হিজরীতে তিনি যশোহর জেলায় বিচার বিভাগে কাজীর পদে যোগদান করেন। অপরাধীকে দন্ডদানে তাঁর মন বিচলিত হয়ে পড়লে তিনি এ পেশা ত্যাগ করে কলিকাতার মুন্সি বু আলী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন হতে তিনি অত্যধিক ইবাদত-বন্দেগীতে মসজিদে এবং কামেল অলিদের মাজারে রাত কাটাতে লাগলেন। এসময় তিনি অন্তর চক্ষুধারী এক কামেল অলি-আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পতিত হন। এই মহাত্মা গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর বংশধর ও ত্বরিকার খেলাফত প্রাপ্ত সর্ব ভারতীয় প্রতিনিধি গাউসে কাওনাইন শেখ সৈয়দ আবু সাহমা মোহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহোরী (র.) সাহেবের নিকট তিনি মুরাদ প্রাপ্ত হন। পীর সাহেবের বড় ভাই খোদার ভাবে চিরকুমার হাজীউল হারমাইন হযরত শাহ্ সৈয়দ দেলোয়ার আলী পাকবাজ (র.) সাহেবের নিকট হতে লাভ করেন কুতুবিয়াতের জজবাতি ফয়েজ (অনুগ্রহ)। এইভাবে গাউসিয়াত ও কুতুবিয়াতের পূর্ণ ফয়েজ লাভে তাঁর মধ্যে খোদারী জজব ও ছলুক (দীপ্ত ও শান্ত) স্বভাব প্রকাশ পেতে থাকে। ইহ ও পরকালীন মুক্তির জন্য দিন দিন বিপুল মানুষ কৃপাপ্রার্থী হয়ে তাঁর নিকট সমবেত হয়ে ধন্য হতে লাগলেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও অসংখ্য কেরামত প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। হযরত খিঁজির (আ.) এর রহস্যময় জ্ঞান, হযরত দাউদ (আ.) এর অবলুপ্ত সুরের প্রকাশ, হযরত সুলায়মান (আ.) এর রাজকীয় ঐশ্বর্য ও হযরত ঈশার (আ.) প্রেমের বাণী, বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফার (দ.) বেলায়তী শান-আহমদী নামের যুগোপযোগী পদচারনা এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা.)র না বলা অনেক কথার কথক, মহর্ষি বিপ্লবী মনসুর হাল্লাজ (র.) এর তাওহীদী চিৎকার, সারমাদ শহীদের বিদ্রোহী ভাষাকে অবলম্বন করে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের বৃক্ষ রোপণ করেছেন গাউসুল আযম হযরত মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

এক ছাড়া দ্বিতীয় নাস্তি, এ বিশ্বাসে সবার শান্তি

মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত নিজধর্ম শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে হানাহানি করে কত লক্ষ কোটি মানুষের জীবন গেছে হাজার হাজার গবেষক নিয়োগ করেও সে সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। এ সংকট হতে মুক্তির জন্য মানব জাতিকে তিনি তাওহীদে আদীয়ান–এক ও অভিন্ন স্রষ্টার বিশ্বাসে স্ব স্ব ধর্মের সহ অবস্থানের আহবান জানান। যেহেতু ধর্মীয় পথ-প্রথা-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও ধার্মিক ব্যক্তির গতি বা লক্ষ্য অভিন্ন স্রষ্টার সন্তুষ্টি, স্মরণ বা ইবাদত। তিনি ধর্মের আচারগত কাজ কর্মের পাশাপশি নৈতিকতার উপর জোর দিতেন। যেহেতু চুরি, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, অবিচার, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ইত্যাদি অন্যায় কাজ কোন ধর্মে অনুমোদিত নয়। অপরাধ প্রবণ মানুষকে নৈতিকতায় উত্তরণ করার জন্যই ধর্মের আবির্ভাব।[৩]

বিশ্ব জুড়ে সবার তরে, যার যা প্রাপ্য দাও তারে

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির কল্যাণে আকাশ-পাতাল ও ভূমিতে বিপুল সম্পদের সমাবেশ করেছেন। এসব সম্পদের মধ্যে আলো, বাতাস, পানির মত কিছু সম্পদকে সকলের জন্য অবারিত

করেছেন। কৃষিজ, খনিজসহ বহু সম্পদের উৎপাদন ও বিলি বন্টনের অধিকার মানুষের এখতিয়ারে দিয়ে দিয়েছেন। এই বিলিবন্টনে মানুষ নিজ বা আপন জনগোষ্ঠির জন্য স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠতে না পারায় বিশ্বজুড়ে যত অশান্তি অসন্তোষ বিবাদ সংগ্রাম যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘটিত হচ্ছে। এমনি ঘটনা-দুর্ঘটনা সভ্যতার প্রথম হতে অদ্যাবধি চলে আসছে। মানব জাতিকে এই মহাসংকট হতে মুক্তি পেতে তিনি আল-কোরানের 'আদলে মোতলাক' বা ন্যায়-নীতির অনুসরণে মানুষের প্রাপ্য অধিকার নির্ণয় ও বন্টনের আহবান জানান। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের বিঘ্ন ঘটার আশংকা দেখা দিলে ন্যায় ভাগের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে আপোস রফা করার উপর তিনি জোর দিতেন।[৪]

মুসা নবীর দশ বিধি, মাইজভাণ্ডারী সাত নীতি

হযরত মূসা (আ.) কে আল্লাহ্তালা দশটি অনুশাসন বিধি দান করেছেন, যা 'টেন কমান্ডমেন্টস' হিসেবে পরিচিত। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সাতটি ধাপ বা সিঁড়ি রয়েছে যা "উসুলে সাবআ" বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি নামে অভিহিত। আসলে এসব নীতি-পদ্ধতি নতুন কিছু নয়। এটা কুরআন, হাদীস ও সুফীবাদের মৌলনির্যাস থেকে আহরিত। ব্যক্তি জীবনে এই নীতি আদর্শ চরিত্রগতভাবে অর্জিত হলে সাধক খিজরী শক্তি সম্পন্ন অলী-আল্লাহ্র মর্যাদায় উন্নীত হন। এমন সাধকের নিকট জীবন জগতের যাবতীয় রহস্য প্রকাশ হয়ে যায়। তাঁরা আল্লাহ্র প্রদত্ত কুন ফয়াকুন শক্তির অধিকারী হয়ে "না হওয়া, না পাওয়া" কোন কিছু তাঁদের ইচ্ছাশক্তিতে করতে সক্ষম। এই কর্মসূচী শুধু ব্যক্তি জীবনে নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বলয়েও ফলপ্রসূ হতে পারে।

এই দর্শনের "উসুলে সাবআ"-সপ্তকর্ম প্রদ্ধতিগুলো হচ্ছে; (১) ফানা আনিল খালক বা আত্মনির্ভরশীলতা (২) ফানা আনিল হাওয়া বা অনর্থ পরিহার (৩) ফানা আনিল এরাদা বা প্রবৃত্তি প্রসূত ইচ্ছা শক্তির বিনাশ (৪) মাউতে আবইয়াজ বা সাদা মৃত্যু (৫) মাউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু (৬) মাউতে আহমর বা লাল মৃত্যু (৯) মাউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু।

(১) ফানা আনিল খালক-আত্মনির্ভরশীলতা: ব্যক্তি জীবনে পর নির্ভরশীলতা পরিহার, আত্মকর্মসংস্থানে মনোযোগী হওয়া, কর্মের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে নিজের মধ্যে স্রষ্টার সম্পর্কে সজাগ হওয়া, অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তোলা। আশরাফুল মখলুকাত বা মানব শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

জাতীয় পেক্ষাপট: জাতীয় সম্পদ ও শ্রমশক্তির যথাযথ ও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিদেশী ঋণ নির্ভরশীলতা পরিহার করা। দেশের প্রতিষ্ঠানিক ও কৃষি, শিল্প, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন। শিক্ষিত জনগোষ্ঠি সৃষ্টি। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন।

আন্তর্জাতিক বলয়: বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বিত করে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে "ওয়ার্ল্ড স্টেটস কো-অপারেটিভ ব্যাংক" বা "বিশ্ব রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করা। এতে জাতীয় আয়ের অনুপাতে সদস্য চাঁদা নির্ধারণ করে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে সহজ শর্তে ঋণদান করে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা।

২। ফানা আনিল হাওয়া: অনর্থ পরিহার। ব্যক্তি জীবনে গীবত, চোগলখোরী, পরনিন্দা, অপরের কাজে নাক গলানো, সামর্থ থাকা সত্বেও কর্মহীন জীবনযাপন করা, যে কাজে হানাহানি ও বিশৃংখলার আশংকা আছে এরূপ কাজ বর্জন করা।

জাতীয় পেক্ষাপটে: সকল প্রকার ভোগ বিলাসদ্রব্য আমদানী ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করা। মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ। ধোঁকা দেওয়ার রাজনীতি পরিহার করা।

আন্তর্জাতিক বলয়: পারমানবিক, রাসায়নিক, জৈবিক অস্ত্র উৎপাদন নিষিদ্ধ করা।

৩। ফানা আনিল এরাদা: প্রবৃত্তিপ্রসূত ইচ্ছার বিনাশ। ব্যক্তি জীবনেঃ নিজের প্রবৃত্তিপ্রসূত ইচ্ছাকে বিলীন করে স্রষ্টার ইচ্ছা তথা তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

জাতীয় প্রেক্ষাপটে: ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে রাষ্ট্রীয় তহবিল, মালামাল বা সুযোগসুবিধাকে ব্যবহার না করা। বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা না করা। প্রভাব ও প্রভূত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে নিজ ক্ষমতাকে ব্যবহার না করা। যে কোন পরাজয়, বিফলতা, অনাস্থা ও জনমতকে উদার চিত্তে গ্রহণ করে নেয়া।

আন্তর্জাতিক বলয়: যে কোন রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন সামরিক জোট ভেঙ্গে দেয়া।

৪। মউতে আবইয়াজ-সাদা মৃত্যু: ব্যক্তি জীবনেঃ সংযম পালন, উপবাসব্রত গ্রহণ, স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা, স্বল্প-বাক জীবনযাপন।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে ও জনগণের মধ্যে কৃচ্ছতা অবলম্বন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। অপচয় ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া।

আন্তর্জাতিক বলয়: জাতিসংঘের উদ্যোগে পালিত বিশ্ব মিতব্যয় দিবসকে বর্ধিত করে এক মাসব্যাপী সমগ্র পৃথিবীতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে কৃচ্ছতা সাধনের অনুশীলন করা। সামরিক ব্যয় হ্রাস করার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি

সম্পাদন।

৫। মউতে আছওয়াদ: কালো মৃত্যু।

ব্যক্তি জীবনে: আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ দমন ও নিয়ন্ত্রণ। অপরের সমালোচনাকে সহজ চিত্তে গ্রহণ করে নিজের দোষত্রুটি খুঁজে দেখা এবং দোষ মুক্তির চেষ্টা করা।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার নিশ্চিতকরণ।

আন্তর্জাতিক বলয়: পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, বর্ণগত দাংগা, নির্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ, দেশ থেকে বিতাড়ন ইত্যাদি রোধকল্পে প্রচলিত জাতিসংঘের নিন্দা প্রস্তাবকে আরো কার্যকরী করে এক বাণিজ্যিক ও সামরিক অবরোধের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা, যাতে এসব অমানবিক আচরণগুলো বন্ধ হয়।

৬। মউতে আহমর: লাল মৃত্যু

ব্যক্তি জীবনে: লোভ, লালসা, যৌনদৃষ্টি, যৌনচিন্তা, কামনা-বাসনা দমন ও সংযতকরণ।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: চরিত্র হননকারী দেশী-বিদেশী ছবি, অশ্লীল ভিডিও, ক্যাবারে ড্যান্স, আনন্দ মেলা, ভিডিও, টিভি ইত্যাদিতে শুচিবিশুদ্ধ তৎপরতায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। এছাড়া বিভিন্ন পর্ণো ম্যাগাজিন ও পত্র পত্রিকাতে যৌন আবেদনমূলক ছবির জন্য কড়া সেন্সর আরোপ করা।

আন্তর্জাতিক বলয়: রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ে নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার না করার আন্তর্জাতিক কনভেনশান স্থির করা। যথেচ্ছাচারী, সমকামীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা প্রদান না করা।

৭। মউতে আখজার: সবুজ মৃত্যু।

ব্যক্তি জীবনে: অল্পে তুষ্ট থাকার মাধ্যমে স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। বাহুল্য পরিত্যাগ, নির্বিলাস জীবনযাপন।

জাতীয় প্রেক্ষাপট: সরকারী অফিস আদালত ও বাসগৃহে জমকালো সাজ-সজ্জা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ খরচ পরিহার করা। সরকারী-বেসরকারী বিলাসবহুল সাজ-সজ্জার উপর ট্যাক্স আরোপ করা।

আন্তর্জাতিক বলয়: দাতাদেশগুলো কর্তৃক চড়া সুদে দরিদ্র দেশগুলোকে দেয়া ঋণ অথবা ঋণের সুদ মওকুফ করে দেয়া। মহাশূন্য, ভূমি ও ভূগর্ভে সঞ্চিত আল্লাহ্‌র সকল সম্পদ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের নীতিমালা তৈয়ার করা। অত্র আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ব্যক্তি জীবনের উন্নয়নের জন্যে প্রণীত মাইজভাণ্ডারী সপ্তকর্মপদ্ধতি জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক বলয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। মাইজভাণ্ডারী দর্শন যে শুধুমাত্র একটি পরাবাস্তব বা ভাববাদী দর্শন নয় বরং জীবন জগতের সকল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান দিতে সক্ষম, তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট।

দেশে দেশে ভাণ্ডারী, তাওহীদের কাণ্ডারী

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেছেন, "আমার বাগানে আঠার হাজার ফুল।" এতে বুঝা যায়, তাঁর আঠার হাজার প্রতিনিধি বা খলিফা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও সাধক গুনীজনেরা ছিলেন তাঁর মনোনীত খলিফা। ভিন্নধর্মাবলম্বী ক'জন সাধকও তাঁর প্রতিনিধিত্ব পেয়েছিলেন। সুদূর অস্ট্রেলিয়া, চীন হতে ইরাক পর্যন্ত তাঁর খলিফাদের খোঁজ পাওয়া যায়। ৫

নিজ বংশ ধারায় যে কয়েকজন ব্যক্তি অধ্যাত্ম সাধনায় অতি উচ্চমার্গে উন্নীত হয়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম;

(১) বেলায়তে মা'য়াব শাহজাদায়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮৬৫-১৯০২)।

(২) কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) (১৮৬৫-১৯৩৭ খৃঃ) (ভ্রাতুষ্পুত্র)।

(৩) কুতুবুল ইরশাদ হযরত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল (ক.) (ভ্রাতুষ্পুত্র)।

(৪) অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) (১৮৯২-১৯৮২খৃঃ) (পৌত্র)

(৫) হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ শামসুল হুদা (ক.) (প্রদৌহিত্র)

(৬) বিশ্বঅলী শাহানশাহ্ হযরত মওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.) (১৯২৮-১৯৮৮ খৃঃ) (প্রপৌত্র)

রহমতের রশিতে বাঁধা, সমগ্র সৃষ্টি-সভ্যতা

"তোমরা আল্লাহ্‌র রশিকে দৃঢ় ভাবে ধর; পরস্পর পৃথক হয়ো না (আল কুরআন : সুরা আল ইমরান : আয়াত ১০৩)। সুফী মতবাদী তফসীরকারদের মতে এই আয়াতে আল্লাহ্‌তালা তাঁর রহমত বা করুণাধারা দান ও গ্রহণের মাধ্যমের প্রতি ইংগিত করেছেন। এরা হলেন আল্লাহ্‌র নবী ও অলিরা; প্রকৃত অর্থেই যাদের ধরা যায়। যুগে যুগে যাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানুষের ঐক্য, সংহতি ও সভ্যতা। মানব সম্প্রদায়ের নানা ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য রহমত তাঁদের মাধ্যমে বা ওছিলায় আবর্তিত হয়। যদিও সাধারণ লোকেরা তা জানে না; তাই বুঝেও না। ঐতিহাসিক 'বায়াতে রিদওয়ান' তেমনি এক ঘটনা।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব মুহূর্তে রসূলের (দ.) নিকট উপস্থিত সকল সাহাবা হাত ধরে বায়াত বা দীক্ষা নিয়েছিলেন। সবসময় একজন বিশ্বঅলি সৃষ্টি জগতের প্রাণ হিসেবে বর্তমান থাকেন। এ বিশ্বঅলির জন্মধন্য রত্নপ্রসবা উনবিংশ শতাব্দী (১৮০১-১৯০০ খৃঃ) জগতে সর্বক্ষেত্রে এত অধিক মনীষীর আবির্ভাব অন্য কোন শতাব্দীতে নয় নাই। রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা ও সাহিত্যসহ সকল বিষয়ে বিশ্বসভ্যতা যেন কয়েক শতাব্দীর অবদান ও আবিষ্কারকে এক লাফে ডিঙ্গিয়ে গেলো।

বিশ্বঅলি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনকালেই মানবতার দুষ্টব্যাধি কুখ্যাত দাস প্রথা পৃথিবীর বুক হতে উচ্ছেদ হয় (১৮৮৩ খৃঃ) এবং প্রথম বিশ্ব সংগঠন আন্তর্জাতিক রেডক্রস গঠিত হয় (১৮৬৪) খৃঃ)। শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দিন এর নিজ বংশধারায় যে কয়েকজন ব্যক্তি অধ্যাত্ম সাধনায় দাবী পূরণের মাধ্যমে অর্জিত হয় ঐতিহাসিক মে দিবস।৬

মাইজভাণ্ডারী বিশ্বনীতি, মজলুমের মিত্র-শক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ধর্মীয় খেলাফতের নামে সাত শত বছরের রাজতন্ত্র তুর্কী সালতানাতের পতন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আগ্রাসী ফ্যাসীবাদী জাপান ও জার্মানীর পতন এবং মিত্রশক্তির বিজয়ে মাইজভাণ্ডারীর মেহেরবানীর বিশেষ ভূমিকা ছিল।৭

মাইজভাণ্ডারী করুণাধারা, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি

১৯৫২ ও ১৯৫৮ সালে দু'বার মাইজভাণ্ডার শরীফ জেয়ারতে গমন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাভ করেন গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হযরত মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) মাইজভাণ্ডারীর দোয়া, দয়া ও পথনির্দেশ। ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের বিপুল নির্বাচনী বিজয় এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে মাইজভাণ্ডারী করুণাধারা গভীরভাবে জড়িত। ১৯৬৮ সালে জেল থেকে লেখা বঙ্গবন্ধুর একখানা চিঠি এবং ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক লেখা অপর একখানা চিঠি, পরস্পরের নিকটে প্রেরিত এই চিঠিগুলো ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। বহু আলেম ও জ্ঞানীগুণীরা মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও এই দর্শনের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্ণনা করে বহু মূল্যবান বই পুস্তক রচনা করেন। সেগুলোর কিছু নমুনা দেওয়া গেলঃ

১। হযরত মওলানা মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভূঁইয়া রচিত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত (বাংলা) ২। হযরত মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) মাইজভাণ্ডারী রচিত বেলায়তে মোতলাকা (বাংলা) ৩। মূলতত্ত্ব (বাংলা), ৪। বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ (বাংলা), ৫। মানব সভ্যতা (বাংলা) ৬। এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক (বাংলা), ৭। মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা রচিত 'অলিকুল শিরোমনি হযরত বাবা ভাণ্ডারী (বাংলা)', ৮। হযরত মওলানা আবদুল গণি রচিত 'আয়নায় বারী (আরবী ও ফার্সী)' ৯। হযরত মওলনা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.) রচিত' আত্ত তাওজিহাতুল বহিয়্যা (আরবী)' ১০। 'তোহফাতুল আখইয়ার (বাংলা)' ১১। হযরত মওলানা আজিজুল হক শের এ বাংলা রচিত 'দেওয়ানে আজিজ (ফার্সী)' ১২। হযরত মওলানা সৈয়দ মূসা আহমদুল হক সিদ্দিকী (র.) রচিত 'আদাবে সলীকা (বাংলা)' ১৩। হযরত মওলানা আবদুল হাদী রচিত 'রত্ন সাগর' ১৪। হযরত মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী রচিত 'প্রেমাঞ্জলী' ১৫। 'তরঙ্গমালা' ১৬। হযরত মওলানা আবদুল্লাহ বাঞ্ছারামপুরী রচিত 'ভক্তিভাণ্ডার' ১৭। 'মুর্শিদ ভাণ্ডার' ১৮। 'ভক্তি দর্পন' ১৯। 'প্রেম ভাণ্ডার' ২০। প্রখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল রচিত 'নূরে দুনিয়া' ২১। 'মুক্তির দরবার' ২২। 'আশেকমালা' ২৩। 'মানব বন্ধু' ২৪। 'নূরে মওলা' ২৫। 'ভাণ্ডারে মওলা' ২৬। মনমোহন রচিত 'মলয়া' ২৭। মোঃ মাহবুব উল আলম রচিত 'ঐশী আলোর জলসাঘর'সহ পাঁচ হাজারের অধিক মাইজভাণ্ডারী গান এবং মাইজভাণ্ডারী খলিফাদের দরবার হতে প্রকাশিত বই পুস্তক সাময়িকী ও পত্র পত্রিকায় মাইজভাণ্ডার ও মাইজভাণ্ডারীর প্রকৃত পরিচয় বহুল প্রচারিত।

অযুত শুভাশিষে সিক্ত
পরম সুন্দর মানব মিলনতীর্থ

আল্লাহ্‌র অলী দরবেশদের জীবন ও তাবত কর্ম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার সেবায় ওয়াক্‌ফ করা, জীবনের সৃজন, পালন এবং বিবর্তনই আল্লাহ্‌র অন্যতম প্রধান দৃশ্যমান হেকমত, মহান স্রষ্টার এই পালনবাদী চেতনাকে সামনে রেখে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রাণপুরুষ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.), কুতুবুল আকতাব হযরত মওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.), খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.), বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাপসগণ প্রাচ্যের এই গগনে যে মহান আদর্শের সামিয়ানা বিস্তার করেছেন সে সামিয়ানার শীতল ছায়াতলে গড়ে উঠেছে সকল প্রকার

কলুষতাবিমুক্ত এক পরম সুন্দর মানব মেলা।

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত
৯ সংস্করণ ১২ পৃষ্ঠা

২। বেলায়তে মোতলাকা
৪র্থ সংস্করণ ৩১-৩২ পৃষ্ঠা

৩। বেলায়তে মোতলাকা
৪র্থ সংস্করণ ৬০-৬৮ পৃষ্ঠা

৪। বেলায়তে মোতলাকা
৪র্থ সংস্করণ ১৯-১২০ পৃষ্ঠা

৫। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত
৯ সংস্করণ ৮৭ পৃষ্ঠা

৬। শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী
২য় সংস্করণ ৪৯ পৃষ্ঠা

৭। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত
৯ সংস্করণ ২০৭ পৃষ্ঠা

ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রসঙ্গে

শওকত হাফিজ খান রুশ্নি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক সংকট হতে ধর্মীয় উগ্রবাদের জন্ম হয়।

বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ সর্বদা প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকে। অত্যন্ত আত্ম প্রত্যয়ের সাথে বলা যায় এদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেনি।

ধর্মীয় উগ্রবাদে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষিত হয় না বরং পালিত হয় উন্নাসিক ধর্মান্ধতা। ধর্মীয় উগ্রবাদে ধর্মীয় জীবনের শুদ্ধতম আচার নিষ্ঠার পরিচর্যা হয় না, বরং পালিত হয় ধর্মীয় অনুভূতির নামে উদ্দেশ্যমূলক প্রতিক্রিয়াশীলতা। তাই যে কোন দেশে এবং যে কোন কালে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ প্রগতির জন্য বিঘ্ন, মানবতার জন্য লজ্জা, সভ্যতার জন্য কলঙ্ক এবং সমাজ কল্যাণের জন্য অভিশাপ হিসেবে পরিগণিত বলেই ঘৃণিত শুদ্ধতম বিবেকের কাছে। ধিকৃত মুক্তি ও সভ্যতার ইতিহাসের কাছে। খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ গভর্ণর হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফকে এক চরম শাস্তি দিয়েছিলেন। কারণ গভর্ণর ইউসুফ মুসলিম বিজিত এলাকায় জোর করে অপর ধর্মাবলম্বীদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। শাস্তির সাথে সাথে খলিফা গভর্ণরকে এ বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, আপনাকে গভর্ণর করা হয়েছে মানুষের খেদমত করতে, জোর করে ধর্মান্তরিত করার জন্য নয়। এ মহান খলিফা ইতিহাসে 'দ্বিতীয় উমর' নামে খ্যাত। তাহলে দেখা যায়, সে সময়ও ইসলামের স্থপতিরা এরকম ধর্মীয় উগ্রবাদী কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ধর্মীয় উগ্রবাদ একটি জঘন্য প্রবৃত্তি। এক ধরণের হিংস্রতা যা মানুষ হয়ে মানুষের বুকে ছুরি চালাতে দ্বিধাগ্রস্ততায় ভুগে না। একথা অনিবার্য সত্য যে ধর্ম এসেছে মানুষের প্রয়োজনে-ধর্মের প্রয়োজনে মানুষ আসেনি। প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) আসার আগে কোন ধর্মের আগমন পৃথিবীতে ঘটেনি। সকল ধর্ম গ্রন্থ এবং মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বয়ং মহান স্রষ্টাও এ ব্যাপারে মানুষের প্রাধান্যকে স্বীকার করে বলেছেন, 'আমি মানুষের ভেদ, মানুষ আমার ভেদ'। তাহলে দেখা যায় মানুষই সব কিছুর উর্ধ্বে। ধর্ম মানুষের মানবিক অস্তিত্বের গতি ও প্রবহমানতাকে নিয়ম শৃংখলার মাধ্যমে পরিচালিত করার একটি মাধ্যম মাত্র। সব জাতির জন্ম ও বিকাশ লগ্নে-সর্বকালে এরকম মাধ্যম ধর্মের নামে এসেছে। এবং মানুষও নিজ নিজ কালের বা সময়ের ধর্মকে অবলম্বন করে মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণকে স্বতঃসিদ্ধ করতে পিছপা হয়নি। যুগ, পরিবেশ ও সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে ধর্মের নাম, নীতি ও শৃংখলার পরিবর্তন সাধন করেছে মানুষ। ইতিহাসের মনোযোগী নিরীক্ষায় দেখা যায় সব পরিবর্তনেরই একটি মাত্র উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবিক প্রগতিকে অক্ষুন্ন রাখা। ধর্ম বা ধর্মীয় আদর্শকে নিয়ে কোন একটি বিশেষ সময়ে মানুষ স্থবির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকেনি বরং আবিষ্কার অন্বেষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ এগিয়ে গেছে। এবং এ মহত্তম অগ্রগতির বিরুদ্ধে যারা স্থবির হয়ে উগ্রবাদী অন্তরে এক জায়গায় বসে থাকতে চেয়েছে– তারাই পরিণতকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ঠাঁই পেয়েছে। যারা স্বীয় ধর্মীর আদর্শকে যুগের প্রয়োজনে নির্মাণ করতে পেরেছেন কিংবা যুগোত্তীর্ণ মানবিক দাবীগুলোকে সামগ্রিক বা সার্বজনীন করতে পেরেছেন তাঁরাই হয়েছেন সর্বক্ষেত্রে দুর্মর এবং চিরন্তন। এবং তাঁরা সর্বদা এই অভিশপ্ত সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদকে প্রত্যাখান করে এগিয়ে গেছেন। সব যুগেই আমরা দেখেছি ধর্মীয় উগ্রবাদী বিকৃত চিন্তায় কিংবা অশুভ উদ্দেশ্যের প্রণোদনে কিছু মানুষ সাময়িকতার হুজুগে জীবনঘাতী তৎপরতায় আল্লাহ্‌র জমিনকে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

মানুষের রক্তে সিক্ত করেছে। এরা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে করেছে বিভ্রান্ত এবং মানবতাকে করেছে রক্তাক্ত। আর এসবকে মদদ দিয়ে থাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসক শোষক শ্রেণী; কারণ শোষণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার মানসে আজকের এ ধর্মীয় উগ্রবাদীরা ভয়াবহতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক শোষক শ্রেণীর প্রশ্রয়ে এবং প্রগতিশীল শক্তির বিপর্যয়ের কারণ। আজকের সভ্য সমাজে ধর্ম নিয়ে যতো বিতন্ডা ও রক্তপাত ঘটছে তা সবই ধর্মীয় উগ্রবাদেরই হীন জঘন্য শাঠ্য ও শঠতার কারণে। এসব সংঘাতে ধর্ম শুধু আশ্রয়-আড়ালে থাকে অন্য এক উদ্দেশ্য। ইসলামের অভ্যুদয় কালে আমরা দেখেছি এ উগ্রবাদীদের অশুভ আগ্রাসন হতে ইসলামের মহত্তম আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো রেহাই পায়নি। রেহাই না পাওয়া সত্ত্বেও ইসলামের সর্বব্যাপীতার কারণে এ ধর্মীয় উগ্রবাদ পরাজিত হয়েছে। পরাজিত হলেও এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি আবার সময় ও সুযোগে মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে। ইসলামের উন্মেষকালের চার খলিফার পরবর্তী দু'জন এ ধর্মীয় উগ্রবাদী পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। সংঘটিত হয়েছে একই কারণে কারবালার মর্মস্পর্শী ঘটনার। রাজ্য শাসন নিয়ে ভাতৃঘাতী হানাহানিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে উমাইয়া ও আব্বাসীয় গোত্রের অস্তিত্ব। রাজতন্ত্র বিরোধী ইসলামী অনুশাসনের পরিষ্কার ব্যাখ্যা ও অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও চলেছে রাজতন্ত্রের শাসন। সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার উৎস হয়েছে সাধারণ জনগণের পরিবর্তে গোত্রিয় বা গোষ্ঠিগত চক্রের বাহুবল। এসব নীতিহীনতাকে ধর্মীয় উগ্রবাদ ধর্মীয় মৌলিকতা হিসাবে চিহ্নিত করে অতীতে বর্তমানে সর্বত্রই চালাচ্ছে অশুভ চক্রান্ত। এ চক্রান্ত যেমন আমরা দেখেছি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কিংবা উমাইয়া-আব্বাসীয় রাজত্বে কিংবা মোগল যুগে, তেমনি দেখছি বর্তমানের সমস্যা ক্রান্ত পেট্রোডলারের মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে। ইসলামে রাজতন্ত্র নিষিদ্ধ অথচ ইসলামের জন্মভূমি খোদ সৌদী আরবেই চলছে রাজতন্ত্রের শাসন।

ইসলামে যেখানে স্বৈরাচারীতার কোন প্রশ্রয় নেই সেখানে মুসলিম দেশগুলোতে চলছে দল বা ব্যক্তির স্বৈরাচারী শাসন– তাও ইসলামের আবরণে। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক অনুশাসনের বদলে চলছে নীতিহীন উগ্রবাদীতার বিনামে সাম্প্রদায়িকতারই অনুশীলন।

সালাম লহো বাবা

- এস. এম. আমিরুল ইসলাম, বি, সি, এস

বালু চরে ভেসে আসে একটি ঝিনুক
রাশি রাশি মনিমুক্তা ভরা তার বুক।
রবির কিরণ লেগে করে ঝল মল
ঝরনার পানি ছুটে উদ্দাম উচ্ছ্বল।
বারে বারে ধায় মন প্রভু দরশনে
কত শত দিন রাত কাটে আনমনে
কানন গিরি নগর জনপদ কত।
অবিরাম ঘুরে চলে উলকার মত।
ভাসে চোখে নিত্যদিন প্রভুর দীদার
তারি ধ্যানে পায় শুধু, আনন্দ অপার
একটানা বহু দিন কাটে অন্নহীন
মুখে তার স্বর্গ শোভা চিত্ত অমলিন।
নব নব স্পর্শ লাভ হয় দিনে দিনে
জীবনের ভোগ সুখ তুচ্ছ ভাবে মনে
একা একা পথ চলে শুধু আনমনা
ললাট ভরিয়া হাসে শুভ আলপনা।
ডালে ডালে পাখী সব সুরে ভুলে চায়
পান্থ চলিছে পথ কিসের ইশারায়
চলিতে চলিতে পথ হয় চলা শেষ
একদিন খুঁজে পায় পথের নির্দেশ।
রীতিমত গৃহে ফিরে গৃহের প্রসূন
মুক্তা মালা বেড়ে যায় বহু শত গুণ
গ্রাম খানি ফিরে পায় নবীন আঙ্গিক
আনন্দের বান ডাকে পূর্ণ চারিদিক।

হযরত গাউসুল আজম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) বাবাজান কেবলা ভাণ্ডারীর পূন্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

আমি আল্লাহ্‌কে মান্য করি

অনুবাদক : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

আমি আল্লাহ্‌কে মান্য করি
হযরত আদম আলাহিস্ সালাম এর গল্প

প্রশ্নমালা

১. কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

২. আমরা কথা শুনবো ও কাকে মানব?

৩. শয়তান কে? সে কি ফেরেশ্‌তা?

৪. কোন মানুষকে আল্লাহ্ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন?

শব্দ শিখি: আদম, জ্বিন, শয়তান, ইবলিস, রাজীম, মান্য করা, জান্নাত।

আল্লাহ্ মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর নাম রাখেন আদম। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রথম মানুষ। তাই আদমের না ছিল বাবা, না ছিল মা। তিনি প্রথম নবীও আদমের কাহিনি পড়ে আমরা জানতে পারি আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করা কতটা জরুরী।

বহু বহু দিন আগের কথা। তখন লোকজন ছিলনা। আল্লাহ্ সকল ফেরেশ্‌তাকে কাছে ডাকলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা আদমকে সিজদা করো। তিনি প্রথম মানুষ। তোমরা তাঁকে সম্মান করো। সকল ফেরেশ্‌তা আদমকে সিজদা করল। কিন্তু ইবলিস সিজদা করল না। ইবলিস ছিল অহঙ্কারী। সে আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করল। কারণ আদম মাটির তৈরি। আর ইবলিস আগুনের তৈরি।

তোমরা কি জানো, কোন সব প্রাণী আগুনের তৈরি?

জ্বীন হলো আগুনের তৈরি। কিছু জ্বীন ভালো, কিছু জ্বীন খারাপ। ইবলিস ফেরেশ্‌তা ছিলনা। ইবলিস ছিলো ভালো জ্বীন। আল্লাহ্ তাকে আদেশ দেন আদমকে সিজদা করতে। সে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করল। সে পরিণত হলো খারাপ। ইবলিস ভেবেছিল সে আদম থেকে উত্তম। কি করে ইবলিস এমন বাজেভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করতে পারল?

ইবলিসের কাজটি মোটেও সঠিক ছিল না। আল্লাহ্ তার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। আল্লাহ্ তাই ইবলিসকে বললেন: "তুমি এখান (বেহেশ্‌ত) হতে বের হয়ে যাও। কারণ তুমি হলে গিয়ে রাজীম (অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত)।" সূরা: আল হিজর, আয়াত: ৩৪।

আল্লাহ্ ইবলিসকে বেহেশ্‌ত হতে বের করে দিলেন। তাকে বললেন, পরবর্তীতে তুমি থাকবে জাহান্নামে। তার নূতন নাম হলো শয়তান। এর অর্থ হলো সে আল্লাহ্‌র রহমতে হতে বিতাড়িত আর সে জ্বলতে থাকবে জাহান্নামের আগুনে। শয়তান তখন থেকে শপথ নিল সে মানুষকে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করতে ও খারাপ কাজ করতে প্ররোচনা দেবে। ফলে তারাও তার মতো দোযখে যাবে। সেদিন হতেই শয়তান চেষ্টা করে আসছে যাতে মানুষ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে ও খারাপ খারাপ কাজ করে।

তোমরা কি শয়তানের কথা শুনবে ও খারাপ সব কাজ কর্ম করবে? কিছুইতে না! না!! না!!!

সদাচরণ: সব সময় বলবে: আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানীর রাজীম।

যখনই শয়তান তোমাদের গোনাহ কাজ করতে কুমন্ত্রণা দেবে অথবা তোমাদের মনে খারাপ কিছু করার ইচ্ছা জাগবে তখনই তোমরা এ বাক্যটি পড়বে। এর অর্থ হচ্ছে: অভিশপ্ত শয়তানের হাত হতে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই।

আল্লাহ্ আদমকে সব কিছুর নাম শেখালেন। যতকিছু জানার প্রয়োজন আদম সব জেনে নিলেন।

একদিন আদম ঘুম হতে জাগলেন। তিনি দেখলেন একজন নারী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। আল্লাহ্ এ নারীকে আদমের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন আদমের স্ত্রী। কেননা কোনো বিজ্ঞজন তাঁর নাম বলেছেন হাওয়া বা ঈভ। কুরআন তাঁর নাম প্রকাশ করেনি। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তাঁর নাম জানাননি।

আদম ও তাঁর স্ত্রী বেহেশ্‌তে বসবাস করতেন। বসবাসের জন্য বেহেশ্‌ত ছিল অতি উত্তম ও মনোরম স্থান। সেখানে তাদের জন্য প্রচুর খাবার ছিল। তাঁদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই সেখানে পাওয়া যেত। আল্লাহ্ আদমকে ও তাঁর স্ত্রীকে বললেন বেহেশ্‌তে তারা যা মন চায় তাই খেতে পারবে। তবে তাঁদেরকে একটা বিশেষ গাছের ফল খেতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, সে গাছটির ফল খেলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আল্লাহ্‌র কথা মেনে আদম তাঁর স্ত্রী গাছটির নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিরত রইলেন।

এরপর একদিন শয়তান এলো আদম ও তাঁর স্ত্রীর কাছে। সে

বলল, তাদের উচিত সে গাছের ফল খাওয়া। তাহলে তাঁরা ফেরেশ্‌তা হয়ে যাবেন আর চিরদিন বেহেশতে থাকতে পারবেন।

শয়তান অবশ্যই মিথ্যা বলেছিল! আল্লাহ্ তাঁদের খাওয়ার জন্য অনেক অনেক ফলের গাছ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা নিষিদ্ধ গাছের কিছু ফল খেলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত কাজ করলেন। তোমরা কি মনে করো, এতে তাঁরা ফেরেশ্‌তা হয়ে গিয়েছেন? তাঁরা কি চিরজীবী হয়ে গিয়েছিলেন? তাঁরা কি বেহেশতে বসবাস করতে পেরেছিলেন? না! আদম ও তাঁর স্ত্রী ফেরেশ্‌তা হননি। তাঁরা চিরজীবী হননি। তাঁরা বেহেশ্‌তেও বসবাস করতে পারেননি। শয়তান তাঁদেরকে ধোঁকা দিয়েছিল। আল্লাহ্ আদম ও তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তাঁরা খুবই ভুল কাজ করেছেন। আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করায় তাঁরা খুবই পেরেশান হয়ে পড়ে। তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইলেন। তাঁদের প্রতি দয়াবান হওয়ার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা জানালেন।

জ্ঞানগর্ভ বচন: পবিত্র কুরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত-২৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।

সদাচরণ: আসতাগফিরুল্লাহ্। অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই।

আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে দু'টো হচ্ছে: আল গাফ্‌ফার এবং আল গফুর। অর্থ: আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল।

আল্লাহ্ আদম ও তাঁর স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিলেন। আর তাঁদেরকে পাঠিয়ে দিলেন দুনিয়ায়।

দুনিয়ার বুকে হযরত আদম আলাইহিস সালাম: আদম ও তাঁর স্ত্রী এক মহা শিক্ষা পেলেন। তাঁরা ছিলেন খুবই সরল ও আন্তরিক। তাই আল্লাহ্ তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন। আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে ভুল করায় তাঁরা যারপরনাই দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন শয়তানের প্ররোচনায় কান দেয়া তাঁদের উচিত হয়নি।

আল্লাহ্ তাঁদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। বেহেশ্‌তের মহাসুখের জীবন হতে দুনিয়া একেবারেই ভিন্ন। এখানে আদম ও তাঁর স্ত্রীকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। তাদেরকে ঘুরতে হতো খাদ্যের খোঁজে। নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হতো। প্রয়োজন হতো কাপড়ের। তাঁদের দরকার ছিল হাতিয়ার।

তাঁরা বেহেশ্‌তকে হারিয়ে দিলেন!!

আদম ছিলেন দুনিয়ার প্রথম নবী। আদম ও তাঁর স্ত্রীর সন্তান সন্ততি ছিল। তাঁরা তাদের আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন। তাদেরকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হয়। তাঁরা তাদেরকে ভালো ও সৎ মানুষ হবার শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে বেহেশ্‌তে যেতে পারে। তাঁদের সন্তানদের ঘরেও অনেক ছেলে-মেয়ে জন্ম নিয়েছিল। [এ ভাবে দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে।] তাদের কেউ কেউ ছিল ভালো ও সৎ। তারা আল্লাহ্‌কে মানত। অনেকেই শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বিপথগামী হয়ে পড়েছিল।

আল্লাহ্ আদম ও তাঁর স্ত্রীকে ক্ষমা করেছিলেন। কারণ তাঁরা ছিলেন সহজ সরল ও বিশুদ্ধ চিত্ত। আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে তাঁরা সত্যিকার অর্থে দুঃখিত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ দুনিয়ায় আদমকে প্রথম নবী বানিয়েছিলেন।

শয়তান আমার দুশমন

শয়তানের কথায় কখনো কান দিও না
কখনো বন্ধু হবে না সে তোমার
পাঠ করো কুরআন, সিজদা করো দরবারে আল্লাহ্‌র
এতেই নিমগ্ন হও, থাকো নির্ভর নির্ভর
যদি শয়তান দেয় মন্দ কাজ বা কথার সাথে সাথে বা কথার সাথে সাথে বলো "আসতাগফিরুল্লাহ্।"
তাতেই পালিয়ে যাবে সে।
শয়তান....
সে কখনো বন্ধু হবে না তোমার। শয়তান বেগানা পুরুষের মতো প্রথম দৃষ্টিতে তাকে মনে হবে মনোহর, কথা মিষ্টি মধুর, সে পেতে রাখে ফাঁদ কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে আরো একবার! কানে কানে বিনয়ের সাথে বলবে সে: "মা বাবার কথায় কান দেয়ার প্রয়োজন নেই" কিন্তু তার কথা নির্জলা মিথ্যা সব মুসলিম জানে কতই না জঘন্য সে।
শয়তান....
সে কখনো বন্ধু হবে না তোমার!

সে ঘুরে চুপিসারে
তুমি টেরই পাবে না যে সে আছে আশে-পাশে
সে ওপরে নিচে আছে
থাকে চারপাশ ঘিরে
সাবধান! সাবধান!! সকল মুসলমান
মধুর স্বরে দেবে সে প্ররোচনা
"কুরআন পড়ো না, নামায পড়ো না"
তখন শুধু পড়ো বলো "আসতাগফিরুল্লাহ্।"
তাতেই পালিয়ে যাবে সে
শয়তান....
সে কখনো হবে না বন্ধু তোমার!
শুধু নির্ভর করো আল্লাহ্‌র উপর
শয়তান....
"আউযুবিল্লাহ্!"

জ্ঞানগর্ভ বচন: সূরা ত্বা-হা : ১১৬-১২৩
বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম
সরল বাংলা

১১৬- যখনি আমি ফেরেশতাদের বললাম: তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করল, ইবলিশ ছাড়া। সে অমান্য করল।

১১৭- অতঃপর আমি বললাম; হে আদম ও তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু অতএব সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের না করে দেয় তাহলে তোমরা কষ্টে পড়ে যাবে।

১১৮- এখানে প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে যাতে তোমরা ক্ষুধার্ত হবে না, হবে না বস্ত্রহীন।

১১৯- এবং তোমরা পিপাসার্ত হবেনা, রোদে কষ্টও পাবেনা।

১২০- কিন্তু শয়তান তাকে প্ররোচনা দিল, বলল, হে আদম আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদায়িনী এক বৃক্ষের সন্ধান দেবো এবং বলে দেবো এমন এক রাজত্বের কোনদিন লয় প্রাপ্ত হবে না?

১২১-তারা উভয়ে সে গাছের ফল খেলো, তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়লো, তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে থাকলো। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল এবং হয়ে পড়ল বিভ্রান্ত।

১২২- এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন।

১২৩- তিনি বললেন, তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ হতে হেদায়ত আসে, তবে যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পড়বে না।

অনুশীলন

এক সপ্তাহের জন্য একটা তালিকা প্রস্তুত কর। প্রতিদিন তিনটি ভালো কাজের কথা লিখ, যা তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করেছ। যেভাবে হযরত আদম আলাহিস্ সালাম ও তাঁর স্ত্রীই করতেন। এভাবে আমরা সব কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। আমাদের কর্তব্য সব সময় আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করা। আমরা আল্লাহ্‌কে যতবেশি স্মরণ করবো আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ততই কম হবে।

সদারচরণ

সবসময় এ কথা মনে রাখবে যে, শয়তান তোমার শত্রু। সর্বদা আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলবে এবং শয়তানের বিরোধিতা করবে।

প্রশ্নমালা:

১. আল্লাহ্ প্রথম যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার নাম কী? তিনি কি নবী ছিলেন?
২. আল্লাহ্ যখন সিজদা করতে বললেন তখন কে আদেশ অমান্য করেছিল? তার কী শাস্তি হয়েছিল?
৩. শয়তান তোমাকে নিয়ে কী করতে চায়?
৪. কোনো খারাপ কাজ করে ফেললে কী বলবে? কেন?
৫. কাকে সবসময় স্মরণ করা উচিত? কেন?
৬. কোন নামগুলোর বদৌলতে আল্লাহ্ আমাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দেন?

আমার প্রথম পছন্দ ইচ্ছা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

প্রশ্নমালা

১. কোনো ভালো কাজ করার পূর্বে কার কথা স্মরণ কর তুমি?
২. আমাদের সর্বপ্রথম কাকে সন্তুষ্ট করা উচিত?
৩. খেলাধূলা, খাওয়া দাওয়া অথবা ঘুমানোর চাইতেও কাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত?
৪. আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে, আমরা ভালো কাজ করছি।

শব্দ শিখি:

নিয়ত:, আল-আউয়াল, বিসমিল্লাহ্

লীনা আজ খুবই উত্তেজিত। সে প্রায় দৌঁড়ে ছুটে গেলো শয়ন কক্ষে। আজ সে তার রঙতুলির বক্স খুলবে। সে এতক্ষণ তার মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করেছে। সে তার আজকের হোমওয়ার্কও সেরে রেখেছে। সে আজ খুব খুশি। সে কাগজে রঙ পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করল। তখনই আজান-ঘড়িতে শোনা গেল মাগরিবের আজানের ধ্বনি। সে আঁকা বন্ধ রেখে চুপচাপ আজান শুনল। তারপর দোয়া পড়ল। পরিশেষে আবার শুরু করল ছবি আঁকার কাজ।

লীনা ভাবল: "নামায শুরুর পূর্বে আমি অন্তত একটা ছবি আঁকতে পারব।" সে কথা ভেবেই সে শুরু করল ছবি আঁকা। তখনই ঘরে ঢুকলেন তার মা। মা বললেন; "লীনা তোমার করার মতো আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে কি মনে হয়না।" লীনা খুবই নরমভাবে উত্তর দিল, "আম্মু আমি এ ছবিটা শেষ করেই নামায পড়তে যাচ্ছি।"

মা মাথা নেড়ে বললেন, "এসো লীনা আমার সাথে বিছানায় বসো।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কে তোমাকে রঙের বক্স দিয়েছেন?"

লীনার জবাব: তুমি ও বাবা।

মা জানতে চাইলেন: কে তোমাকে মা ও বাবা দিয়েছেন?

লীনা জবাব দিল: আল্লাহ্ ।

মা: তাহলে তোমার কি উচিত নয় অন্য কিছু করার পূর্বে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা ?

লীনা ভেবে দেখল, "আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া তো আমার কিছু পাওয়ার নেই। তিনি না হলে, আমি রঙের বক্স পেতাম না, কোনো মা বাবা থাকত না আমার, থাকতাম না আমিও! মা হাসলেন। বললেন, "ঠিকই বলছ সোনা, আল্লাহ্ তোমাকে, আমাকে, অন্য সবাইকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

লীনা কাকে সবচেয়ে প্রাধান্য দিতে হবে তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আম্মু। চলো, আমরা নামায পড়তে যাই।

আমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করি, কারণ তিনি অনন্য। তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। আমাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব আল্লাহ্র আনুগত্য করা। যে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে আমাদের আল্লাহ্র নাম নেয়া উচিত। আমাদের ঐ কাজ করা উচিত যাতে আল্লাহ্ খুশি হন। এভাবে আমাদের সব কাজ সৎ কাজরূপে গন্য হবে।

জ্ঞানগর্ভ বচন
হাদিস শরীফ

বর্ণনাকারী আহমদ আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকুনাল্লাহ ওয়া রাসুলুহু আহাব্বা ইলায়হি মিম্মা সিওয়াহুমা। অর্থাৎ তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন না তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কে সবকিছু ও সবার থেকে বেশি ভালোবাস।

উত্তম আচরণ: যে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে বল: "বিসমিল্লাহ" এর অর্থ আল্লাহ্র নামে [শুরু করলাম] প্রত্যেক কাজের শুরুতে আল্লাহ্কে স্মরণ করা উচিত, এতে তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবে। এর বিনিময়ে তিনি আমাদের উত্তম পুরুস্কার দেবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত মেহেরবান। প্রত্যেক কাজে আমাদের নিয়ত হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। নিয়ত মানে ইচ্ছা। তখন লীনা ও তার মা মাগরিবের নামায পড়ছিল। আর জায়েদ ও তার বাবা নামায শেষে মসজিদ থেকে বাসায় ফিরছিল। পথে ঘাসের ওপর কিছু টিনের কৌটা পড়েছিল। জায়েদ খালি কৌটাগুলো কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিল।

জয়েদ তার বাবাকে বলল: "আল্লাহ্ এ দুনিয়াটা আমাদের বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের উচিত এর পরিবেশ ঠিক রাখা এবং একে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। আমাদের শিক্ষক হিবা আমাদেরকে তাই শিখিয়েছেন। আমি আবর্জনাগুলো সরিয়েছি ঘাসকে পরিচ্ছন্ন ও সজীব রাখার জন্য । আশা করি এতে আল্লাহ্ খুশি হবেন।

বাবা জায়েদের কথায় ও কাজে গর্ববোধ করলেন।

তিনি বললেন: ইন্শাআল্লাহ্ তিনি তোমাকে এর জন্য উত্তম পুরুস্কার দেবেন। উত্তম পুরস্কারকে আরবিতে হাসনাত বলা হয়। তোমার নিয়ত সঠিক ও উত্তম। কারণ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ময়লা কুড়িয়ে ডাস্টবিনে রেখেছো। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এভাবে কাজ করা।

আল্লাহ্ হলেন: আল-আউয়াল। এটা আল্লাহ্র গুণবাচক নামের একটি। এর অর্থ সর্ব প্রথম। আল্লাহ্ হচ্ছেন প্রথম। আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখা। যে কোনো কাজ করার পূর্বে তাঁর কথাই আমাদের ভাবা উচিত।

(চলবে)

শিশুতোষ

আবুল ওয়াসিফ

ছোট্ট বন্ধুরা! আজকে আপনাদের সঙ্গে বই পাঠের মজা নিয়ে আলোচনা করবো। আপনারা হয়তো শুনেছেন মাটিতে পাথরে, গাছের বাকলে-পাতায়, পশুর শুকনো চামড়া, হাড়ে অক্ষর অক্ষর শব্দ লিখেই তো মানব সভ্যতার প্রধান লিপিকা 'বই'র সূত্রপাত। কিশোর-তরুণ বন্ধুরা! জেনে রাখা ভালো, বই হচ্ছে মানব জাতির সভ্য হিসেবে গড়ে ওঠার পাদটীকা। মানব সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে বই। তাই বই পড়ুন, নিজেকে জানুন, পৃথিবীকে চিনুন। বিশ্ব নবী (দ.)'র নিকট প্রথম ওহী হচ্ছে "ইকরা বি ইসমি রাব্বিকাল লাযি খালাক্ব।" অর্থাৎ পড়ুন! আপনার প্রভূর নামে। দেখা যায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রথম বাণী এবং সবক হচ্ছে পড়ার, তথা পাঠ করার। তাই আমরা আজকে বই পড়া নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

ছোট বন্ধুরা! বই পড়া শুধু শখের বিষয় নয়, অনন্ত নেশাও বটে। কারণ একটি ভাল বই মানুষের ঘুমিয়ে পড়া অন্তরকে জাগিয়ে তোলে। মনের পরিসরকে বিস্তৃত করে। বই গড়ে তোলে জ্ঞান চর্চার অনন্য এক ভুবন। পৃথিবীময় যতো নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন যেমন– টেলিভিশন, মোবাইল, ইন্টারনেট, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে ঔষধ-চিকিৎসা সবকিছুর পিছনে মৌলিক ভূমিকা রয়েছে বইয়ের। তাই আজকে আমাদের শ্লোগান হোক "বই হোক আমাদের নিত্যসঙ্গী"।

কিশোর-তরুণ বন্ধুরা! জেনে রাখা ভালো, বইয়ের নেশায় যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের জীবন চরিতই আলাদা। আপনারা হয়তো ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নাম শুনেছেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। আপনারা হয়তো জানেন, তিনি সতেরটি ভাষায় অনর্গল বলতে-লিখতে পারতেন। মাত্র পাঁচ ফুট দৈর্ঘের লোকটি উচ্চ শিক্ষার জন্যে কয়েক বছর ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধ্যয়ন ও গবেষণায় রত ছিলেন। একবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ফুটপাতে ছাতা মাথায় রেখে হাঁটছিলেন। ছাতার আবরণে ড. শহীদুল্লাহ্ আবৃত হয়ে পড়ায় এক ফরাসী নাগরিক মন্তব্য করেন, How is it? An Umbrella is walking. খাটো আকৃতির এই লোকটি হলেন, জ্ঞানের বাতিঘর। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অন্যতম সাহসী নেতা। বই পড়া ছিল তাঁর অনন্ত নেশা। তাঁর বই পড়া নিয়ে অনেক ঘটনা গল্পের মতো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

ভাল বই হাতে পেলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ খাওয়া, দাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, ক্লান্তি সবই ভুলে যেতেন। তিনি বইয়ের সঙ্গে এতো বেশি একাত্ম হয়ে পড়তেন যে, আশে পাশে কে আছেন বা কি হচ্ছে তাও খেয়ালে আসতো না। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শিক্ষকদের জন্যে সংরক্ষিত স্থানে একাগ্র হয়ে বই পড়তে থাকেন। গ্রন্থাগার বন্ধ হবার সময় হওয়ায় অন্যান্যরা স্ব স্ব আসন ত্যাগ করে বের হয়ে গেছেন। কিন্তু খাটো মানুষটি পড়ার টেবিলে বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন। তাই কারো নজরে পড়েন নি। কারো নজরে আসবেই বা কেমন করে? ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তো পড়ার টেবিলের চেয়ে তেমন একটু উঁচু নন। গ্রন্থাগারের কর্মচারীরা তাই পড়ার টেবিলে কেউ আছেন কিনা তা খুব খেয়াল করে দেখেন নি। অত:পর কর্মচারীরা দরজা-জানালা বন্ধ করে বাইরে তালা লাগিয়ে বের হয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ পর বই পড়া শেষ হলে তাঁর খেয়াল হলো তার টেবিলের সামনে ব্যতীত কোথাও বাতি জ্বলছে না। ভিতরে বাইরে অন্ধকার। তিনি দ্রুত গেলেন দরজার সামনে। দেখেন দরজা বন্ধ এবং বাইরে তালা লাগানো। অগত্যা কোন রকমে জানালা খুলে বাইরে কেউ আছেন কিনা লক্ষ্য করলেন। কাকেও পেলেন না। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলেন, একজন পথচারী গ্রন্থাগারের পাশের রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। তিনি তাঁকে ডাকলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে রাতে গ্রন্থাগারে তাঁর একাকী অবস্থানের ঘটনা অবহিত করলেন। পথচারী দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের অবস্থা ক্যাম্পাস প্রহরীকে জ্ঞাত করেন। অবশেষে গ্রন্থাগারের দারোয়ান এসে দরজা খুলে দিলে ড.শহীদুল্লাহ অনেক রাতে বাসায় ফেরেন। বইয়ের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণকে বলা হয় জ্ঞান অর্জনের অনন্ত নেশা। তাই ছোট বন্ধুরা! মনে রাখুন, জ্ঞানার্জনের অনন্ত নেশার ভাণ্ডার হচ্ছে বই। সুতরাং চলুন, আমরা সবাই বই পড়ি, বই প্রেমিক হই, বই পড়ার অনন্ত নেশায় ডুবে যাই।

বাণী

"উষর মরুর ধুসর বুকে একটি যদি শহর গড়ো, তার চাইতে অনেক বড় একটি মানুষ, মানুষ গড়ো"

– ওমর খৈয়াম (রহ.)

ছোট্ট বন্ধুরা বলেন তো – বই পড়া ব্যতীত কি মানুষ গড়া সম্ভব?

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন ও সহায়তাধীনে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি এবং প্রতিনিধিদের সাথে ট্রাস্টের মতবিনিময় সভায় আগত অতিথিদের মাঝে মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী

একনজরে

১১৬তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত চতুর্দশ শিশু-কিশোর সমাবেশ ২০২২ উপলক্ষে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

১১৬তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত চতুর্দশ শিশু-কিশোর সমাবেশ ২০২২

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত 'উলামা সমাবেশ'

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত 'আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন'

'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' আয়োজিত 'শিক্ষক সমাবেশ' এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম-এর পরিচালক প্রফেসর হোসেন আহমেদ আরিফ ইলাহী

গাউসিয়া হক মন্‌জিল ব্যবস্থাপনায় ফটিকছড়ি এলাকার ৫৮টি রেজিস্টার্ড এতিমখানার শিক্ষার্থীদের মাঝে একবেলার খাবার বিতরণ

'এস জেড এইচ এম বৃত্তি তহবিল' আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান